ঢাকা বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. বাক্প্রত্যঙ্গের সবচেয়ে বাইরের অংশের নাম কী?
ক) ওষ্ঠ খ) তালু গ) দন্ত ঘ) আলজিভ

২. "তাকে আসতে বললাম, তবু এলো না"– বাক্যটি কোন যোজক নির্দেশ করেছে?
ক) সাধারণ খ) বিকল্প গ) বিরোধ ঘ) সাপেক্ষ

৩. 'গৌণ' অর্থ প্রকাশ করছে কোন উপসর্গ যুক্ত শব্দটি?
ক) হাভাত খ) কদবেল
গ) নিমরাজি ঘ) গরহাজির

৪. 'জাকাত' কোন ভাষার শব্দ?
ক) তুর্কি খ) হিন্দি
গ) ফারসি ঘ) আরবি

৫. 'পকেট মারা'– গঠন বিবেচনায় কোন প্রকার ক্রিয়ার উদাহরণ?
ক) প্রযোজক খ) সরল গ) সংযোগ ঘ) যৌগিক

৬. 'ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না'– এই বাক্যে 'ফুলের' কোন কারক?
ক) সম্বন্ধ খ) অধিকরণ গ) অপাদান ঘ) কর্ম

৭. 'সাকার' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক) আকার খ) নিরাকার গ) সরব ঘ) সরস

৮. 'ক্ষিতি' কোন শব্দের প্রতিশব্দ?
ক) পর্বত খ) আকাশ গ) সমুদ্র ঘ) পৃথিবী

৯. মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি কতটি?
ক) ৭টি খ) ১১টি গ) ৩০টি ঘ) ৩৯টি

১০. বাক্যের মধ্যে অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক বোঝাতে কোন কোন পদের সঙ্গে অর্থহীন কিছু লগ্নক যুক্ত হয়?
ক) বিশেষ্য, সর্বনাম খ) বিশেষণ, ক্রিয়া
গ) অব্যয়, ক্রিয়া ঘ) সর্বনাম, অব্যয়

১১. নিচের কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?
ক) রাজপথ খ) সেতার
গ) মনমাঝি ঘ) ঝড়বৃষ্টি

১২. সাপেক্ষ সর্বনামের উদাহরণ কোনটি?
ক) পরস্পর খ) তুই, তোরা
গ) এই, এরা ঘ) যারা-তারা

১৩. নিচের কোনটি ভগ্নাংশ পূরণবাচক সংখ্যা শব্দ?
ক) তেইশে খ) তেহাই
গ) দ্বাদশী ঘ) পহেলা

১৪. 'তার মঙ্গল হোক।'– কোন প্রকার বাক্য?
ক) অনুজ্ঞাবাচক খ) প্রশ্নবাচক
গ) বিবৃতিবাচক ঘ) আবেগবাচক

১৫. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ কোনটি?
ক) পরিচ্ছেদ খ) তপোবন গ) গবাক্ষ ঘ) একাদশ

১৬. ক্রিয়াজাত অনুসর্গের প্রয়োগ ঘটেছে কোনটিতে?
ক) মাথার উপরে নীল আকাশ।
খ) আজ বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কার খেলা।
গ) মন দিয়ে লেখাপড়া করা দরকার।
ঘ) হারানো ঘড়িটার জন্য অনেক কেঁদেছি।

১৭. কোনগুলো অঘোষ ব্যঞ্জন?
ক) শ, ক খ) দ, ধ
গ) চ, জ ঘ) ভ, ম

১৮. 'এ' বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণের উদাহরণ–
ক) একটা খ) বেলা
গ) দেশ ঘ) খেলা

১৯. বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষ্য অংশকে বলে–
ক) উদ্দেশ্য খ) পূরক
গ) কর্ম ঘ) প্রসারক

২০. নিচের কোনটি যৌগিক বাক্য?
ক) পরিশ্রমীরা জীবনে সাফল্য লাভ করে।
খ) বিপদ ও দুঃখ একসঙ্গে আসে।
গ) লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়।
ঘ) যেহেতু দোষ করেছো, সেহেতু শাস্তি পাবে।

২১. 'চাটুকার' অর্থ কোন বাগ্‌ধারার মধ্যে রয়েছে?
ক) ঠোঁট কাটা খ) ভুঁইফোঁড়
গ) গোঁফ খেঁজুরে ঘ) খয়ের খাঁ

২২. 'শ্মশ্রু' শব্দের অর্থ কী?
ক) শাশুড়ি খ) দাড়ি গ) শ্বশুর ঘ) শুচি

২৩. বক্তার কথা উপস্থাপনের ধরনকে কী বলে?
ক) বাচ্য খ) যোজক
গ) উক্তি ঘ) আবেগ

২৪. নিচের কোনটি ভাববাচ্যের উদাহরণ?
ক) তারা বাড়িটি তৈরি করেছে। খ) চিঠিটা পড়া হয়েছে।
গ) এবার বাঁশিটি বাজাও। ঘ) আমার যাওয়া হলো না।

২৫. কোনটি অনুকার দ্বিত্বের উদাহরণ?
ক) ঝিলমিল খ) টসটস
গ) ঘুমঘুম ঘ) সুরেসুরে

২৬. গুণ-বিশেষ্য কোনটি?
ক) লবণ খ) পর্বত
গ) ভোজন ঘ) দীনতা

২৭. 'বেলে মাটি' কোন জাতীয় বিশেষণ?
ক) অবস্থাবাচক খ) উপাদানবাচক
গ) পরিমাণবাচক ঘ) ভাববাচক

২৮. নিচের কোনটি করুণা আবেগ?
ক) বাহ, চমৎকার লিখেছ। খ) বেশ, তবে যাওয়াই যাক।
গ) যাকগে, ওসব কথা থাক। ঘ) হায় হায়! ওর এখন কী হবে!

২৯. 'টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে'– বাক্যটিতে কোন ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) নেতিবাচক খ) কালবাচক
গ) ধরনবাচক ঘ) স্থানবাচক

৩০. কোন নির্দেশকটি শব্দের পরে আলাদাভাবে বসে?
ক) জন খ) টুকু
গ) খানা ঘ) খানি

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।
একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) বইমেলা

(খ) সুন্দরবন।

২। (ক) মনে করো, তুমি মাহির, দিনাজপুরের বাসিন্দা। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিকারের দাবি জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি নাবিল। কুমিল্লা সদর উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা। তোমার এলাকায় পাঠাগার স্থাপনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

মাতৃস্নেহের তুলনা নাই; কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃস্নেহের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আসল শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না– দুর্বল অসহায় পক্ষিশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বোঝে না– দুর্বলের প্রতি সে স্থিরলক্ষ্য, অসহায় সন্তানের প্রতি মমতার অন্ত নাই– অলসকে সে প্রাণপাত করিয়া সেবা করে– ভীরুতার দুর্দশার কল্পনা করিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে ভীরুকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হয়।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

নিখিলের এত শোভা, এত রূপ, এত হাসি-গান,
ছাড়িয়া মরিতে মোর কভু নাহি চাহে মন-প্রাণ।
এ বিশ্বের সব আমি প্রাণ দিয়ে বাসিয়াছি ভালো–
আকাশ বাতাস জল, রবি-শশী, তারকার আলো।
সকলেরই সাথে মোর হয়ে গেছে বহু জানা-শোনা,
কত কি-যে মাখামাখি, কত কি-যে মায়া-মন্ত্র বোনা।
বাতাস আমারে ঘিরে খেলা করে মোর চারিপাশ,
অনন্তের কত কথা কহে নিতি নীলিমা আকাশ।
চাঁদের মধুর হাসি, বিশ্বমুখে পুলক চুম্বন,
মিটিমিটি চেয়ে থাকা তারকার করুণ নয়ন,
বসন্ত নিদাঘ-শোভা, বিকশিত কুসুমের হাসি,
দিকে দিকে শুধু গান, শুধু প্রেম-ভালোবাসাবাসি।

৪। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

অথবা,

(খ) ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

৫। (ক) মনে করো, তুমি লাবিব, রত্না উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র। তোমার বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ উৎসব উদ্‌যাপন সংক্রান্ত একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রণয়ন করো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি ফারহিন। 'দৈনিক আলোর বার্তা' পত্রিকার বগুড়া জেলা প্রতিনিধি। তোমার জেলার গাবতলি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন সম্পর্কে সংবাদ প্রতিবেদন প্রণয়ন করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) কৃষিকাজে বিজ্ঞান

(খ) মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার

(গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ক	২	গ	৩	খ	৪	ঘ	৫	গ	৬	ক	৭	খ	৮	ঘ	৯	গ	১০	ক	১১	খ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ঘ
	১৬	গ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	খ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ক

রচনামূলক

১. ক. বইমেলা হলো লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মিলনমেলা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন। তাদের সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই ১৯৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকার বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করেন। সেই থেকে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করা হয় একুশে বইমেলা এবং এর নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা। মাসব্যাপী একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় অসংখ্য বই। মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান তোরণটি সাজানো হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। মেলার ভেতরে বটবৃক্ষের বেদিমূলে তৈরি করা হয় নজরুল মঞ্চ। চারদিকে চক্রাকারে থাকে প্রয়াত জ্ঞানীগুণী মনীষীদের ছবি এবং সাজানো থাকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অমর বাণী। মেলায় প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে স্টল এবং স্টলে সাজানো বই। বইমেলায় সাধারণত সৃজনশীল বইয়ের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন রুচির পাঠক তাদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করে বইমেলা থেকে। শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবারই রুচিসম্মত বইয়ের সমাবেশ থাকে মেলায়। এছাড়া বইমেলায় অনেক লেখকের সাথে পাঠকদের সাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমানকালে বইমেলা বা পুস্তক প্রদর্শনীগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য গ্রন্থ প্রকাশনার জগতে এনেছে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। একুশে বইমেলা একদিকে বাঙালির বই কেনা, পাঠাভ্যাস গঠন ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এক মিলনতীর্থ, অপরদিকে এটি বাঙালির সংগ্রামী চেতনা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ।

১. খ. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত বিস্তৃত একটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন নামে পরিচিত। নানা ধরনের গাছপালায় পরিপূর্ণ এই সুন্দরবনে বিচিত্র বন্যপ্রাণী বাস করে। সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় চার হাজার বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবন বিস্তৃত। প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার হিসেবে সুন্দরবন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখান থেকে সংগৃহীত হয় নানা ধরনের কাঠ, মধু, মোম ও মৎস্য। প্রায় চারশো নদী ও খাল এবং প্রায় দুইশো দ্বীপ রয়েছে সুন্দরবনে। সুন্দরবনে যেসব গাছ জন্মে এর মধ্যে সুন্দরী, গোলপাতা, কেওড়া, গেওয়া, গরান, বাইন, ধুন্দুল, পশুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বনে বাস করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, বন্য শূকর, বানর, বনবিড়াল, সজারু ইত্যাদি বন্যপ্রাণী। বিচিত্র প্রজাতির পাখির কলকাকলিতে সুন্দরবন মুখর থাকে। ১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

২. ক. ১৩ই মে, ২০২...
বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক সমকাল,
৩৮৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশের আবেদন।
জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক সমকাল'-এ চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত থাকব।
বিনীত
মাহির
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিকার চাই

'একটি দুর্ঘটনা, সারা জীবনের কান্না'– স্লোগানটি নির্মম বাস্তবতানির্ভর। ইদানীং সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই সংঘটিত হচ্ছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে একটি না একটি সড়ক দুর্ঘটনার খবর চোখে পড়ে। এ ধরনের দুর্ঘটনা যেন দিন দিন বেড়েই চলছে, যার ফলে বহু পরিবার সর্বনাশের সম্মুখীন হচ্ছে। কত মা-বাবা তার সন্তান হারিয়েছে। কত সদ্যবিবাহিতাকে বিধবা-জীবন বরণ করতে হচ্ছে। কত পিতাকে যে পুত্রের লাশ বহন করতে হচ্ছে। দিন দিন মানুষের জীবন অনিরাপদ হয়ে পড়ছে। একথা সত্য যে, 'জন্মিলে মরিতে হবে।' কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে মেনে নেওয়া যায় না।

সাধারণত আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কয়েকটি কারণ হলো– ত্রুটিযুক্ত গাড়ি, অনভিজ্ঞ বা মাদকাসক্ত ড্রাইভার, ধারণ ক্ষমতার অধিক মাল বা যাত্রী বহন, ওভারটেকিং বা চালকের দায়িত্বহীনতা, ট্র্যাফিক আইন না মানার প্রবণতা ইত্যাদি। এসব সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন– পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সবাইকে যানবাহন বিধি ও আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া, রাস্তা সংস্কার, ট্র্যাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মিডিয়াগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

আশা করি, উপরিউক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।
নিবেদক
মাহির

২. খ. ৫ই জুন, ২০২...
বরাবর
চেয়ারম্যান,
শুভপুর ইউনিয়ন পরিষদ, কুমিল্লা।
বিষয় : পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।
জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত শুভপুর ইউনিয়নের অধিবাসী। আমাদের গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। গ্রামে শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে একটি বড়ো গ্রাম্য বাজার ও নানা ছোটো শিল্প কারখানা, স্কুল, মাদরাসা, একটি ক্লাবঘর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, জ্ঞানপিপাসু ছেলেমেয়েদের জ্ঞানপিপাসা মেটানোর জন্য উক্ত অঞ্চলে বা তার আশেপাশে কোনো পাঠাগার নেই। ফলে জ্ঞানার্জন তথা শিল্পসাহিত্যে সময় ব্যয় করার মতো কোনো মাধ্যম নেই। গ্রামে উঠতি বয়সি যুবক ছেলেরা নানা রকম আড্ডাবাজিতে সময় নষ্ট করে। এতে কেউ কেউ বিপথগামীও হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইতঃপূর্বে এ ব্যাপারে কয়েকবার আবেদন নিবেদন করেও কোনোপ্রকার সাড়া পাওয়া যায়নি।
এমতাবস্থায়, মহোদয়ের কাছে বিনীত অনুরোধ যে, এই গ্রামের বাজারে একটি পাঠাগার স্থাপন করে বাধিত করবেন।
নিবেদক
গ্রামবাসীর পক্ষে
নাবিল
শুভপুর, কুমিল্লা

৩. ক. মাতৃস্নেহ অতুলনীয় এবং সন্তানের পরিপুষ্টির সহায়ক। তবে অতিরিক্ত স্নেহ কখনো কখনো সন্তানের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে। ফলে সে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হতে দূরে সরে যায়।

৩. খ. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পৃথিবীকে অপরূপ করেছে। প্রকৃতি মানুষের মনকে পুলকিত করে; আবার প্রকৃতির প্রেমে মানুষের মন বাঁধা পড়ে। এই মায়া ত্যাগ করে কেউই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চায় না।

৪. ক. দুর্জন মানে দুষ্ট প্রকৃতির লোক। এ ধরনের মানুষ যত বিদ্বানই হোক না কেন তার সাহচর্যে একটি পবিত্র চরিত্র সহজেই কলুষিত হয়। তাই বিদ্বান দুর্জনের সাহচর্য ত্যাগ করা উচিত।
বিদ্যাশিক্ষা মানবজীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়। বিদ্বান মানুষ তাই সকলের দ্বারা সম্মানিত, সকলের নিকট পূজনীয়। বলা হয়ে থাকে, বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। জ্ঞানীর নিদ্রা মূর্খের ইবাদতের চেয়েও মূল্যবান। কথাটি হাদিসেই এসেছে। তাই জ্ঞানী বা বিদ্বান মানুষের মূল্য সম্পর্কে সংশয় থাকার কোনো অবকাশই নেই। বস্তুত বিদ্বান মানুষ আলোকিত, আলোকপ্রাপ্ত। পতঙ্গ যেমন আলোর কাছে ভিড় করে তেমনি সমাজের মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ। তাদের সঙ্গ ও সাহচর্য সবাইকে পরিতৃপ্ত করে। ধর্মীয় উপদেশ এবং জ্ঞানীদের নীতিকথায় সকলকে বিদ্বানের সান্নিধ্য লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তবে জ্ঞানী মানুষ পেলেই তার কাছে সভক্তিতে ছুটে যেতে হবে এমন নয়। বিদ্বান ব্যক্তি যদি সচ্চরিত্র ও সুন্দর মানবীয় গুণের অধিকারী না হয় তাহলে সে মূর্খের চেয়েও বিপজ্জনক। কারণ মূর্খ মানুষকে কেউ অনুসরণ বা অনুকরণ করে না। তাদের কথাও কেউ মানতে চায় না। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তির কথা মানুষ অন্ধের মতো অনুসরণ করে, তার জীবনাচরণকে অন্যরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই বিদ্বান ব্যক্তি যদি দুর্জন বা অসৎ হয় তাহলে তার দ্বারা সাধারণ মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটার আশঙ্কা খুব বেশি। তাই বিদ্বান ব্যক্তি চরিত্রবান কিনা, তা না দেখে তার প্রতি ঝুঁকে পড়া উচিত হবে না। বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যদি মানবজীবনে গড়ে না ওঠে তাহলে সে বিদ্যার কোনো মূল্য নেই। এ ধরনের মানুষ জ্ঞানপাপী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। আর জ্ঞানপাপীকে এড়িয়ে চলাতেই সকলের মঙ্গল।
দুর্জন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও সে সদা পরিত্যাজ্য। তার সাহচর্যে এলে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। তাই তার সাহচর্য ত্যাগ করা উচিত।

৪. খ. ক্ষুধার্ত মানুষের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষুন্নিবৃত্তি। সব কিছুর মধ্যেই সে ক্ষুধা নিবৃত্তির কথা ভাবে। তখন কোনো কিছু সুন্দর কি অসুন্দর, তা তাকে ভাবায় না।

প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কতগুলো মৌলিক চাহিদা রয়েছে। খাদ্য হলো এর মধ্যে প্রধান মৌলিক চাহিদা। খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের শরীরে তৈরি হওয়া এই খাদ্যের চাহিদারই অপর নাম ক্ষুধা। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। মানুষ যে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, তার পেছনে এই ক্ষুন্নিবৃত্তিই মূল চালিকাশক্তি। ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ার পরেই মানুষ অন্যান্য মৌলিক চাহিদার কথা ভাবে। বাসস্থানের কথা ভাবে, পোশাকের কথা ভাবে, স্বাস্থ্যের কথা ভাবে। সুন্দর-অসুন্দরের কথা ভাবে একেবারে শেষ পর্যায়ে। তাই ক্ষুধা যখন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সৌন্দর্যের মূল্য তার কাছে থাকে না। একজন সুখী মানুষের কাছে পৃথিবীকে সুন্দর মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে তা নাও হতে পারে। অতীতে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যেত। সামান্য দুটো রুটির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে সারাদিন পরিশ্রম করতে হতো। সেই দুর্ভিক্ষে একজন শ্রমজীবীর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ বড়োজোর একখানা ঝলসানো রুটির মতো মনে হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পৃথিবীর সৌন্দর্য কোনো তাৎপর্য বহন করে না। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তার সবচেয়ে আগে দরকার খাদ্য। গদ্যের কাঠিন্যটুকু সে ভালো উপলব্ধি করতে পারে; কাব্যের সুধা তার কাছে অর্থহীন।

৫. ক.

রত্না উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

লাবিব, শেরপুর, ১৪ই জুলাই, ২০২... : ১০ই জুন থেকে শেরপুরের রত্না উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় ৬৫টি স্টল মেলায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এ মেলা। মেলায় ছিল মানুষের উপচে-পড়া ভিড়। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণিসহ সব বয়স এবং সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। মেলায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিক্রি হয়।

মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন বিকালবেলা আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্দীপনামূলক ও গণসংগীতের ব্যবস্থাও ছিল মেলায়। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক জনাব আলি ইদ্রীস সুজন। আলোচনায় অংশ নেন শেরপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. ইফতেখারুল আমীন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জামিল হোসেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার মামুন সরোয়ার। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুর জেলাপ্রশাসক ইয়াসিন মোল্লা।

বক্তাগণ বলেন যে, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু রয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ৩০ শতাংশ বনভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে সে মোতাবেক অগ্রসর হতে হবে। বক্তাগণ প্রত্যেককে অন্তত তিনটি করে চারাগাছ লাগানোর জন্য আহ্বান জানান। তাহলে আমাদের দেশে অতিরিক্ত প্রায় ৬০ কোটি গাছ লাগানো সম্ভব হবে; যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। মেলায় সমাপনী দিনে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে সবুজায়ন নার্সারি।

৫. খ.

'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন

ফারহিন, বগুড়া জেলা প্রতিনিধি : শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গাবতলি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২... দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব জসিম উদ্দিন।

সকাল ৭টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভোর থেকেই বিদ্যালয়ের আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা খালি পায়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করেন। বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের খালি পায়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারির অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয় শোভাযাত্রা। অবশেষে সকাল ৮টায় শহিদ মিনারের পাদদেশে সকলে উপনীত হলে প্রধান শিক্ষক প্রথম পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অমর শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ফুলের তোড়া শহিদ মিনারে অর্পণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

শহিদ দিবস ও মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচি ছিল কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। শহিদ মিনারের বেদিমূলে সবুজ ঘাসের গালিচার উপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিগণের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। পরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়। আবৃত্তিশেষে শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক গানই ছিল এ পর্যায়ের মূল আকর্ষণ।

বিকেলে আয়োজন করা হয়েছিল আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মুহম্মদ সামাদ। বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী মাতৃভাষা দিবসের ওপর আলোচনা করে। আলোচনার শেষে ছিল পুরস্কার বিতরণ পর্ব। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কবিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান অতিথি। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদকের নাম : ফারহিন
প্রতিবেদনের শিরোনাম : 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন।
প্রতিবেদনের প্রক্রিয়া : বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের সময় : দুপুর ১২টা
প্রতিবেদনের তারিখ : ২৩/০২/২০২...

৬. ক. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রম পরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানবসভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।

৬. খ. **ভূমিকা :** মাদকাসক্তি আমাদের সমাজের ভয়াবহ একটি সমস্যা। কিছু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষ নিজেকে মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। একটি জাতির উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করে তরুণসমাজ। কিন্তু মাদক তরুণসমাজের সেই অদম্য কর্মপ্রেরণাকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে নিজেকে যেমন ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তেমনি দেশকেও মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাই এর প্রতিকার করা অত্যাবশ্যক।

মাদকের আবির্ভাব বা উৎস : নেশার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মদ, গাঁজা, আফিম, চরস বা তামাকের কথা বহু অগে থেকেই মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে মাদকের ব্যবহার শুরু হয়, যাকে ইংরেজিতে ড্রাগ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের ব্যথার উপশম হিসেবে ড্রাগের ব্যবহার হলেও পরে হতাশা কাটাতেও তারা ড্রাগ ব্যবহার করতো। এরপর থেকেই কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশে নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ড্রাগের ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীব্যাপী।

মাদকদ্রব্যের প্রকারভেদ : সমাজে নানা ধরনের মাদকদ্রব্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– হেরোইন, প্যাথেড্রিন, এলএসডি, মারিজুয়ানা, কোকেন, হাসিস প্রভৃতি আধুনিককালের মাদকদ্রব্য; তবে এর মধ্যে হেরোইন ও কোকেন বেশ দামি। আমাদের দেশের যুবসমাজ সচরাচর যে মাদকদ্রব্যগুলো ব্যবহার করে সেগুলো হলো– সিডাকসিন, ইনকটিন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, ডেক্সপোটেন, গাঁজা ইত্যাদি। তবে এ সবকিছুর ব্যবহারকে ছাড়িয়ে গেছে অত্যাধুনিক এক মাদক যার নাম ইয়াবা।

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার : দেশে মাদকের ব্যবহার বহু বিচিত্র। মানুষ নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ করতে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। মাদকের ব্যবহার করে সে কল্পনার জগতে বিচরণ করে। এক্ষেত্রে মাদক ব্যবহারকারীরা নানা ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে। যেমন– ধূমপান, ইনহেল বা শ্বাসের মাধ্যমে, জিহ্বার নিচে গ্রহণের মাধ্যমে, সরাসরি সেবনের মাধ্যমে, স্কিন পপিং ও মেইন লাইনিংয়ের মাধ্যমে। তবে যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন তাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো নেশায় উন্মত্ত হওয়া। প্রথমে কৌতূহলের বশে অনেকেই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে অভ্যস্ত হয়ে ভয়াবহ এক সর্বনাশের পথে এগিয়ে যায় তারা।

মাদকাসক্তির কারণ : এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ ব্যক্তিজীবনের হতাশা। মানুষ যখন জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়ে, তখন সে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয়। হতাশাগ্রস্ত সাধারণ তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের হারও অনেক বেশি। তাছাড়া অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হয়েও অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। যেসব পরিবারে পারিবারিক অশান্তি অনেক বেশি, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের জীবন বিশৃঙ্খল হতে থাকে। তারা এই বিশৃঙ্খলা থেকে ধীরে ধীরে মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরা প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় এ ধরনের অনেক ঘটনাই লক্ষ করি। বেশির ভাগ মাদকসেবী দেখা যায় যারা বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীর সংস্পর্শে মাদকে আসক্ত হয়, তবে পারিবারিক অশান্তিই মাদকাসক্তির বিশেষ কারণ হিসেবে দেখা যায়।

মাদক চোরাচালান : সাধারণত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদক চোরাচালান হয়। সীমান্তে স্থল বা জলপথে এবং আকাশপথে বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ মাদক চোরাচালান নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে যার পেছনে রয়েছে বিরাট এক সিন্ডিকেট। কিছুকাল আগেও মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের 'স্বর্গভূমি'। তবে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই নেটওয়ার্ক ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পরেই চোরাচালানকারীরা ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে গড়ে তোলে ড্রাগ পাচারের নতুন ভিত্তিভূমি, যার নাম 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'।

বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন : বাংলাদেশে মাদকের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা এই মাদক আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মায়ানমার থেকে অবাধে এদেশে প্রবেশ করছে ইয়াবা, যাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে বহু তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতি। দর্শনার 'কেরু এন্ড কোম্পানি' এদেশের একমাত্র লাইসেন্সধারী মদ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তার বাইরে বহু বিদেশি কোম্পানির মদ অবৈধভাবে অবাধে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গাঁজা ও আফিমের মতো মাদকদ্রব্যও অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতা : মাদকাসক্তিকে অপ্রতিরোধ্য রোগ এইডসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাদকাসক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ইয়াবা ও হেরোইনের মতো মাদকদ্রব্য মানুষের শরীরের সমস্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এর আসক্তিতে মানুষ এক অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে। নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ জীবনে ফিরে আসাও খুব সহজ হয় না। শরীরে মাদক গ্রহণ বন্ধ করা মাত্রই 'উইথড্রয়াল সিমটম' শুরু হয়। তখন মাদক না পেলে শুরু হয় টার্কি পিরিয়ড; হাত পা কাঁপতে থাকে; অসম্ভব শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তা হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে। তখন সুচিকিৎসা না পেলে খুব অল্প সময়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ : বিশ্বজুড়ে যে মাদকবিষ ছড়িয়ে পড়ছে তার থাবা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সমাজসেবীরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দেশে দেশে নানা সংস্থা ও সংগঠন মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। আমাদের দেশেও মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যম মাদকবিরোধী জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে :

১. মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভেষজ ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ,
২. সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নেশার হাতছানি থেকে তাদের দূরে রাখা,
৩. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মাদকাসক্তির মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা,
৪. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা,
৫. বেকার যুবকদের জন্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

উপসংহার : মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যায় তরুণরাই বেশি আসক্ত। একটি দেশের গতিশীলতাকে অব্যাহত রাখে তরুণসমাজ। তারাই যদি মাদকের কবলে পড়ে নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, তবে দেশের সার্বিক অগ্রগতি চরমভাবে বিনষ্ট হবে। তাই তরুণসমাজকে মাদক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এর কারবারিদের সর্বাগ্রে বয়কট করতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা বাংলাদেশ মাদকমুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হোক।

৬. গ. **ভূমিকা :** প্রকৃতির রূপ বড়োই বিচিত্র। প্রকৃতি মানুষের জন্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার এ প্রকৃতিই মানুষের জীবনে দুর্যোগ বয়ে আনে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, খরা, মহামারি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদ বিনষ্ট হয়। মানুষ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তবে আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। নানা কারণে বাংলাদেশে বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী : দুর্যোগ বলতে আমরা বুঝি, যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে বোঝায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক উপাদানের চরম অস্বাভাবিক অবস্থা, যাতে মানবসমাজ বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাই প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ বা অবস্থা। বাংলাদেশে হয় এমন প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

ঝড় : পৃথিবীর অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও তীব্র বাতাস ও বজ্র বিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টিপাত ঝড়ের সাধারণ চিত্র। এসময় সমুদ্র থাকে উত্তাল।

ঘূর্ণিঝড় : ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের তীব্রতা হয় অনেক বেশি। কখনো কখনো ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যায়। সমুদ্রে সৃষ্টি হয় জলোচ্ছ্বাসের। প্রতিবছরই এপ্রিল থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বরে বাংলাদেশে ছোটো বড়ো ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। প্রবল শক্তিসম্পন্ন এ ঝড়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালির উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমুদ্রতীরবর্তী দ্বীপসমূহ। ১৯৭০ সালে মেঘনা মোহনায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, গবাদিপশু ও ফসলেরও ক্ষতি হয় প্রচুর। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, প্রায় ছয়

শত কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে শক্তিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। এর ফলে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশ্বের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টর্নেডো : বাংলাদেশে টর্নেডো আঘাত হানে সাধারণত এপ্রিল মাসে, যখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ থাকে। এটি স্বল্পকালীন দুর্যোগ, আঘাতও হানে স্বল্প এলাকা জুড়ে। কিন্তু যেখানে আঘাত হানে সেখানে মাত্র দশ-বিশ মিনিটের মধ্যেই ঐ এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

কালবৈশাখী ঝড় : কালবৈশাখী সাধারণত এপ্রিল-মে মৌসুমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এর গতিবেগ সাধারণত ৪০–৬০ কিলোমিটার হয়ে থাকে। ব্যাপ্তিকালও স্বল্প, কখনো কখনো এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। কালবৈশাখী সাধারণত আঘাত হানে শেষ বিকেলের দিকে। মাঝে মাঝে এ ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়।

বন্যা : বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয়। বন্যায় এদেশের এক বিস্তৃর্ণ ভূ-ভাগ প্লাবিত হয়। ঋতুগত কারণে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নদ-নদীর পানি বেড়ে যায় এবং নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও পাহাড়ি ঢল, জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের কারণে বাংলাদেশে বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় প্রাণহানি কম হলেও সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অনেক গবাদিপশু মারা যায়। বন্যাপরবর্তী সময়ে খাদ্যাভাব এবং নানারকম রোগব্যাধি দেখা দেয়। গৃহহীন হয়ে পড়ে অনেক লোক। বাংলাদেশে **১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪** ও **২০০৭** সালে সৃষ্ট বন্যায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। **১৯৭৪** সালে বন্যার পরপরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তাতে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। **১৯৮৮** ও **১৯৯৮** সালের বন্যায় মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। **২০১৮, ২০১৯** সালেও এদেশের কোথাও কোথাও ব্যাপক বন্যা হয়।

নদীভাঙন : বাংলাদেশে প্রতিবছর নদীভাঙনের ফলে বসতভিটা ও ফসলি জমি নদীর বুকে বিলীন হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক সহায় সম্বলহীন হয়ে গ্রাম থেকে শহরে আশ্রয় নেয়।

ভূমিধস : ভূমিধস পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি পাহাড়ি এলাকায় বর্ষা মৌসুমে মাঝে মাঝে পাহাড় ধসে পড়ে। পাহাড়ের কোলঘেঁষে গড়ে ওঠা অনেক ঘরবাড়ি চাপা পড়ে, ঘটে প্রাণহানি। নির্বিচারে ও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পাহাড় কাটার কারণেও ভূমিধস হয়। ভূমিধসের কারণে পাহাড়ি এলাকায় সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ভূমিকম্প : ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ ও মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও আসাম এলাকায় **১৮৯৭** সালে **৮.৭** মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় দেড় হাজার মানুষ মারা যায়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এ ধরনের ভূকম্প একই এলাকায় একশ থেকে একশ ত্রিশ বছর পর আবার আঘাত হানতে পারে। এছাড়া প্রতি বছর ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকায় এক বা একাধিক মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

আর্সেনিক দূষণ : ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলার অধিবাসীরা মারাত্মক আর্সেনিক দূষণের শিকার।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকার : প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবেই প্রাকৃতিক। এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে নিম্নোক্তভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায় :

১. এদেশের বন্যা সমস্যা মোকাবিলার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বনায়ন করা এবং নদীর পানি বহন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নদী খনন করা যেতে পারে।

২. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে লোকজনকে দ্রুত সরিয়ে নিতে হবে নিরাপদ স্থানে। প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

৩. ভূমিকম্প হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। ধ্বংসযজ্ঞ হলে দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষ অসহায়। তবু অদৃষ্টবাদী হয়ে বসে না থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা যেমন থাকা জরুরি তেমনি ব্যাপক জনসচেতনতারও প্রয়োজন।

রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. 'নিয়মিত সাঁতার কাটো, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে'– এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক সরল খ যৌগিক
গ মিশ্র ঘ জটিল

২. 'শিক্ষককে জানাও'– এ বাক্যে 'শিক্ষককে' কোন কারকের উদাহরণ?
ক কর্তা কারক খ করণ কারক
গ অপাদান কারক ঘ কর্ম কারক

৩. 'মরি তো মরব'– এ বাক্যে 'তো' কোন প্রকারের ক্রিয়াবিশেষণ?
ক কালবাচক খ ধরনবাচক
গ পদাণু ঘ নেতিবাচক

৪. কর্মবাচ্যে ক্রিয়াপদ কাকে অনুসরণ করে?
ক কর্ম খ কর্তা গ কর্মকর্তৃ ঘ ক্রিয়া

৫. 'যেমন কর্ম তেমন ফল'– এ বাক্যে কোন প্রকারের সর্বনাম রয়েছে?
ক সকলবাচক খ নির্দেশক গ পারস্পরিক ঘ সাপেক্ষ

৬. বক্তার কথা উপস্থাপনের ধরনকে কী বলে?
ক সমাস খ উক্তি গ বাচ্য ঘ বিভক্তি

৭. ইতিবাচক অর্থের শব্দ নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোনটিতে?
ক অপরূপ খ গবাক্ষ গ জ্যাঠামি ঘ পলান্ন

৮. 'বাইরে পরিপাটি' অর্থ কোন বাগ্ধারার মধ্যে রয়েছে?
ক সপ্তমে চড়া খ গভীর জলের মাছ
গ ননীর পুতুল ঘ লেফাফা দুরস্ত

৯. 'সলিল' শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ কোনটি?
ক পানি খ সিন্ধু গ পবন ঘ অচল

১০. গুণ-বিশেষ্য কোনটি?
ক ভোজন খ আনন্দ গ পরিবার ঘ লবণ

১১. কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ কোনটি?
ক ক খ ল
গ র ঘ হ

১২. 'উপশম' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক বৃদ্ধি খ হ্রাস
গ পতন ঘ উদার

১৩. 'দিন' শব্দের অর্থ 'দিবস' হলে শব্দজোড় হিসেবে 'দীন' শব্দের অর্থ কী?
ক ইসলাম খ দিয়ে
গ দরিদ্র ঘ রোজ

১৪. ওষ্ঠের মধ্যকার ফাঁকের কম-বেশির ভিত্তিতে স্বরধ্বনিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

১৫. যেসব শব্দের শেষে কারচিহ্ন নেই, সেসব শব্দের শেষে কোন বিভক্তির প্রয়োগ হয়?
ক -তে খ -এর গ -র ঘ -য়ের

১৬. যুক্তবর্ণ কয় রকম হয়?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

১৭. 'মৌ, বউ' শব্দের উচ্চারণের মধ্যে কোন কোন স্বরধ্বনি রয়েছে?
ক আ + ই খ আ + উ
গ ও + উ ঘ অ + ই

১৮. শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা যুক্ত হলে সেই ব্যঞ্জনের উচ্চারণ কী হয়?
ক সংবৃত খ বিবৃত
গ দ্বিত্ব ঘ নাসিক্য

১৯. 'নজর' শব্দের সাথে 'সু' উপসর্গ যুক্ত হলে শব্দের অর্থের কী ধরনের পরিবর্তন ঘটবে?
ক সম্প্রসারণ খ বিপরীতার্থক
গ বিয়োজন ঘ সংকোচন

২০. নিচের কোন সমস্ত পদটি উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ক মুখচন্দ্র খ শশব্যস্ত
গ পদ্মআঁখি ঘ সিংহপুরুষ

২১. বৃহৎ অর্থে প্রত্যয়যুক্ত শব্দ কোনটি?
ক বাঘা খ ঢাকাই
গ ডিঙা ঘ জমিদারি

২২. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ কোনটি?
ক উল্লাস খ সঞ্চয়
গ ষষ্ঠ ঘ বৃহস্পতি

২৩. ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনের উদাহরণ কোনটি?
ক পটাপট খ এলোমেলো
গ বুঝে-সুঝে ঘ ঝিলমিল

২৪. 'তেহাই' কোন প্রকারের পূরণবাচক শব্দ?
ক সাধারণ খ ভগ্নাংশ
গ তারিখ ঘ ক্রমবাচক

২৫. 'কলম, বাকি, আদালত'– কোন ধরনের বিদেশি শব্দ?
ক ফারসি খ তুর্কি
গ আরবি ঘ হিন্দি

২৬. নিচের কোন বাক্যে অবস্থাবাচক বিশেষণ পদের উদাহরণ রয়েছে?
ক ঠান্ডা পানি খ অনেক লোক
গ খুব ভালো ঘ চলন্ত ট্রেন

২৭. নিচের কোনটি যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ?
ক ব্যাট করা খ রাজি হওয়া গ উঠে পড়া ঘ গরম করা

২৮. 'যত পড়ছি, ততই নতুন করে জানছি'– এ বাক্যে কোন ধরনের যোজক রয়েছে?
ক কারণ খ বিরোধ গ বিকল্প ঘ সাপেক্ষ

২৯. 'মন দিয়ে লেখাপড়া করা দরকার'– এ বাক্যে 'দিয়ে' কোন ধরনের অনুসর্গ?
ক সাধারণ খ সাপেক্ষ
গ ক্রিয়ামুখী ঘ ক্রিয়াজাত

৩০. অক্রিয় বাক্যের উদাহরণ কোনটি?
ক তার মঙ্গল হোক খ আমার মা চাকরি করেন
গ তিনি বাংলাদেশের নাগরিক ঘ তারা তোমাদের ভোলেনি

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।
একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) বইমেলা

(খ) মোবাইল ফোন

২। (ক) মনে করো, তুমি ফরহাদ, কুমিল্লায় থাকো। একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানিয়ে ঢাকার বন্ধু সোহাগের কাছে পত্র লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি রাতুল, সিলেটে থাকো। ডাকযোগে পুস্তক পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে একটি স্বনামধন্য প্রকাশনীর বিক্রয় কর্মকর্তার কাছে আবেদনপত্র লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

অভ্যাস ভয়ানক জিনিস– একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন; মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে ধীর ও সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক করো সপ্তাহে অন্তত একদিন তুমি মিথ্যা বলবে না। ছয়মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্য কথা বলতে অভ্যাস করো। তারপর এক শুভ দিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করো, সপ্তাহে তুমি দুইদিন মিথ্যা বলবে না। এক বছর পরে দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে তখন ইচ্ছা করলেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা কারো না। তাহলে সব পণ্ড হবে।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

দৈন্য যদি আসে, আসুক, লজ্জা কিবা তাহে?
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথি মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে,
ঊর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস।

৪। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

অথবা,

(খ) মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে,
হারা শশীর হারা হাসি, অন্ধকারেই ফিরে আসে।

৫। (ক) মনে করো, তুমি সৈকত, একটি দৈনিক পত্রিকার খুলনা প্রতিনিধি। তোমার এলাকায় 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন সম্পর্কিত একটি সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি সুমনা, একটি দৈনিক পত্রিকার বরিশাল প্রতিনিধি। তোমার এলাকার একটি প্রধান সড়কের দুরবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদন প্রণয়ন করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) সময়ানুবর্তিতা

(খ) কৃষিকাজে বিজ্ঞান

(গ) মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	খ	২	ঘ	৩	গ	৪	ক	৫	ঘ	৬	খ	৭	গ	৮	ঘ	৯	ক	১০	খ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ক	১৫	খ
	১৬	ক	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	গ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	গ

রচনামূলক

১. ক. বইমেলা হলো লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মিলনমেলা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন। তাদের সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই ১৯৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকার বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করেন। সেই থেকে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করা হয় একুশে বইমেলা এবং এর নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা। মাসব্যাপী একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় অসংখ্য বই। মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান তোরণটি সাজানো হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। মেলার ভেতরে বটবৃক্ষের বেদিমূলে তৈরি করা হয় নজরুল মঞ্চ। চারদিকে চক্রাকারে থাকে প্রয়াত জ্ঞানীগুণী মনীষীদের ছবি এবং সাজানো থাকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অমর বাণী। মেলায় প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে স্টল এবং স্টলে সাজানো বই। বইমেলায় সাধারণত সৃজনশীল বইয়ের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন রুচির পাঠক তাদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করে বইমেলা থেকে। শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবারই রুচিসম্মত বইয়ের সমাবেশ থাকে মেলায়। এছাড়া বইমেলায় অনেক লেখকের সাথে পাঠকদের সাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমানকালে বইমেলা বা পুস্তক প্রদর্শনীগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য গ্রন্থ প্রকাশনার জগতে এনেছে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। একুশে বইমেলা একদিকে বাঙালির বই কেনা, পাঠাভ্যাস গঠন ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এক মিলনতীর্থ, অপরদিকে এটি বাঙালির সংগ্রামী চেতনা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ।

১. খ. এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে বহন করা যায় এমন ফোনকে বলে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন আবিষ্কারের আগে দূরবর্তী কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে টেলিফোন নামক যন্ত্র রাখতে হতো। এর সংক্ষিপ্ত নাম ফোন। বিভিন্ন বাড়ি বা অফিসে তারের মাধ্যমে ফোনগুলো যুক্ত থাকত। অন্যদিকে মোবাইল ফোন তারবিহীন প্রযুক্তি হওয়ায় এটি যেখানে খুশি সেখানে বহন করা যায়। মোবাইল ফোনকে কখনো সেলুলার ফোন, হ্যান্ড ফোন বা মুঠোফোন নামে অভিহিত করা হয়। মোবাইল ফোনে আজকাল কথা বলার পাশাপাশি আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির যাবতীয় সুবিধা ভোগ করা যায়। এই সুবিধা আছে যেসব মোবাইল ফোনে, সেগুলোকে বলে স্মার্ট-ফোন। এই স্মার্টফোনে কথা বলা যায়, খুদে বার্তা আদান-প্রদান করা যায়, ই-মেইল করা যায়, বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে পৃথিবীর যাবতীয় তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, গান শোনা যায়, নাটক দেখা যায়, রেডিয়ো শোনা যায়, টিভি দেখা যায়। অপরাধী শনাক্ত করার কাজেও আজকাল মোবাইল ফোন গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রথম চালু হয় ১৯৯৩ সালে। প্রায় ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দশ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

২. ক.

২৫শে মে, ২০২...
চান্দিনা, কুমিল্লা।

প্রিয় সোহাগ,
শুরুতেই শুভেচ্ছা নিয়ো। অনেক দিন তোমার কোনো চিঠিপত্র পাচ্ছি না। আশা করি সবাইকে নিয়ে ভালো আছ। গত 'মাঘী পূর্ণিমার' ছুটিতে আমি আর সুব্রত বগুড়া জেলায় অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড় দেখতে গিয়েছিলাম। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন পুরাকীর্তি বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য নিদর্শন ও ভাস্কর্য সম্পর্কে শুধু বইতে পড়েছি। এবার স্বচক্ষে দেখে মুগ্ধ হলাম। প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের কথা চিঠিতে লিখে ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব কি না জানি না। তবুও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের আনন্দঘন অভিজ্ঞতা তোমার সাথে ভাগ করে নিতেই কলম ধরলাম।
দিনটি ছিল মঙ্গলবার। সকাল বেলায় আমরা দুজন মহাস্থানগড়ের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে ভগ্নপ্রায় বিরাট দ্বিতল ইমারত। সামনে বিশাল পুকুর। চারপাশে সারি সারি গাছ। পুরাতন সেই ইট-পাথরের প্রতিমূর্তি বাংলার অবলুপ্ত শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাস্তার দুপাশে রয়েছে পুরানো অট্টালিকা। প্রাচীন যুগের কিছু স্থাপত্য নিদর্শন এবং ইতিহাসের উত্থান-পতনের কাহিনি। এসব দেখতে দেখতে যেন অতীতে হারিয়ে গেলাম। সময় পেলে তুমিও একবার দেখতে এসো বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড়। ভালো লাগবে। তোমার লেখাপড়া কেমন চলছে? ভালো থেকো। তোমার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
ফরহাদ

[বি. দ্র. : পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

২. খ. ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২...
বরাবর
বিক্রয় কর্মকর্তা
চ্যান্সেলর পাবলিকেশন্স
১৪, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১০০০।
জনাব
সবিনয় নিবেদন এই যে, পত্র পাওয়ার পর অবিলম্বে আপনাদের সদ্য প্রকাশিত নিম্নলিখিত বইগুলো অনুগ্রহ করে ভিপিপি যোগে পাঠিয়ে বাধিত করবেন। বইগুলো পৌঁছানো মাত্র আমি মূল্য পরিশোধপূর্বক ভিপিপি ছাড়িয়ে নেব ইনশাআল্লাহ।
আপনার বিশ্বস্ত
রাতুল
সিলেট।

বইয়ের তালিকা

১. পরীক্ষা প্রস্তুতি সিরিজ; নবম-দশম শ্রেণি; চ্যান্সেলর সম্পাদনা পর্ষদ; ১ সেট।
২. বিদ্যাভূষণ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনা সম্ভার; নবম-দশম শ্রেণি; এস.এম. ফজলুর রহমান; ২টি।

		ডাকটিকিট
প্রেরক রাতুল সিলেট।	প্রাপক বিক্রয় কর্মকর্তা চ্যান্সেলর পাবলিকেশন্স ১৪, প্যারীদাস রোড, ঢাকা–১১০০।	

৩. ক. অভ্যাসের দাস না হয়ে ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সাধনায় ব্রতী হওয়া উচিত। এটাই মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ। মিথ্যা বলার প্রবণতা দূর করে সত্য বলার অভ্যাস গঠনের জন্য চাই সাধনা। সাধনার মাধ্যমেই মানুষ পাপ ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফল হতে পারে।

৩. খ. ধৈর্য ও সাহস নিয়ে মানুষকে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় পথ অতিক্রম করতে হয়। দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে লড়াই এবং বিপদকে মোকাবিলা না করে জীবনে সাফল্য অর্জিত হয় না।

৪. ক. দুর্জন মানে দুষ্ট প্রকৃতির লোক। এ ধরনের মানুষ যত বিদ্বানই হোক না কেন তার সাহচর্যে একটি পবিত্র চরিত্র সহজেই কলুষিত হয়। তাই বিদ্বান দুর্জনের সাহচর্য ত্যাগ করা উচিত।

বিদ্যাশিক্ষা মানবজীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়। বিদ্বান মানুষ তাই সকলের দ্বারা সম্মানিত, সকলের নিকট পূজনীয়। বলা হয়ে থাকে, বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। জ্ঞানীর নিদ্রা মূর্খের ইবাদতের চেয়েও মূল্যবান। কথাটি হাদিসেই এসেছে। তাই জ্ঞানী বা বিদ্বান মানুষের মূল্য সম্পর্কে সংশয় থাকার কোনো অবকাশই নেই। বস্তুত বিদ্বান মানুষ আলোকিত, আলোকপ্রাপ্ত। পতঙ্গ যেমন আলোর কাছে ভিড় করে তেমনি সমাজের মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ। তাদের সঙ্গ ও সাহচর্য সবাইকে পরিতৃপ্ত করে। ধর্মীয় উপদেশ এবং জ্ঞানীদের নীতিকথায় সকলকে বিদ্বানের সান্নিধ্য লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তবে জ্ঞানী মানুষ পেলেই তার কাছে সভক্তিতে ছুটে যেতে হবে এমন নয়। বিদ্বান ব্যক্তি যদি সচ্চরিত্র ও সুন্দর মানবীয় গুণের অধিকারী না হয় তাহলে সে মূর্খের চেয়েও বিপজ্জনক। কারণ মূর্খ মানুষকে কেউ অনুসরণ বা অনুকরণ করে না। তাদের কথাও কেউ মানতে চায় না। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তির কথা মানুষ অন্ধের মতো অনুসরণ করে, তার জীবনাচরণকে অন্যরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই বিদ্বান ব্যক্তি যদি দুর্জন বা অসৎ হয় তাহলে তার দ্বারা সাধারণ মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটার আশঙ্কা খুব বেশি। তাই বিদ্বান ব্যক্তি চরিত্রবান কিনা, তা না দেখে তার প্রতি ঝুঁকে পড়া উচিত হবে না। বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যদি মানবজীবনে গড়ে না ওঠে তাহলে সে বিদ্যার কোনো মূল্য নেই। এ ধরনের মানুষ জ্ঞানপাপী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। আর জ্ঞানপাপীকে এড়িয়ে চলাতেই সকলের মঙ্গল।

দুর্জন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও সে সদা পরিত্যাজ্য। তার সাহচর্যে এলে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। তাই তার সাহচর্য ত্যাগ করা উচিত।

৪. খ. হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন। দুঃখের সময় ভেঙে পড়লে চলবে না। কেননা দুঃখের পরেই আসে সুখ। দুঃখের পাশাপাশি সুখ আসবে এটাই স্বাভাবিক।

জগৎ সংসারে মানুষ সর্বদাই সুখের কাঙাল, মানুষের প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তই সুখের হয়ে উঠুক এটাই প্রার্থিত। দুঃখকে পরিহার করার সংগ্রামেই মানুষ প্রতিনিয়ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুখ অর্জনের জন্য কষ্টের প্রয়োজন। আর এই কষ্টই হলো দুঃখকে বরণ করে নেওয়া। আর এ দুঃখের রজনী যতই গভীর হয় সুখের অভ্যুদয় ততই নিকটবর্তী হয়ে আসে। পতঙ্গ আনন্দ বিহারে যতই ঊর্ধ্ব গগনে উড়তে থাকে, ততই এর পতনের মুহূর্ত নিকটবর্তী হতে থাকে। দুঃখের রাত্রি পার হয়েই আসে আনন্দঘন সুপ্রভাত। সুখ মানুষকে আনন্দ দেয়। তাই সুখের প্রতিই তার পক্ষপাতিত্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুঃখ হতেও যে অমৃত লাভ করা যায়, মানুষ তা অনুভব করে না। বাস্তব জীবনেও দুঃখ কষ্টের প্রয়োজন আছে। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পতিব্রতের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়েই মানুষের চিত্ত শুচিশুভ্র হয়ে ওঠে, মানুষ নতুনতর মহিমান্বিত জীবন লাভ করে। সুতরাং দুঃখের পথ বেয়েই আসে সুখ শান্তির আয়োজন। মেঘ যতই গভীর ও ঘনতর হয়ে আসুক না কেন, সূর্যকে গ্রাস করবার বা অবলুপ্ত করবার মতো ক্ষমতা তার নেই। মেঘ সব সময় থাকে না। মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য হেসে উঠবেই। পতনোন্মুখ তরঙ্গও আবার পরক্ষণে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। অমাবস্যার যে অন্ধকার চাঁদকে সাময়িকভাবে গ্রাস করেছে তার পরদিনই হেসে ওঠে নতুন চাঁদ। শীত চিরস্থায়ী নয়। শীতের পর বসন্ত আসবেই।

সুতরাং মানুষকে দুঃখরূপ কালো মেঘের ঘনঘটায় ভেঙে পড়লে চলবে না, বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসে তার মোকাবিলা করতেই হবে। মনে রাখতে হবে, দুঃখের কালো মেঘ কেটে এক সময় সুখের সোনালি সূর্য হেসে উঠবেই।

৫. ক.

'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে খুলনা জিলা স্কুলে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২... দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব জসিম উদ্দিন।

সকাল ৭টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভোর থেকেই বিদ্যালয়ের আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা খালি পায়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করেন। বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের খালি পায়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারির অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয় শোভাযাত্রা। অবশেষে সকাল ৮টায় শহিদ মিনারের পাদদেশে সকলে উপনীত হলে প্রধান শিক্ষক প্রথম পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অমর শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ফুলের তোড়া শহিদ মিনারে অর্পণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

শহিদ দিবস ও মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচি ছিল কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। শহিদ মিনারের বেদিমূলে সবুজ ঘাসের গালিচার উপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিগণের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। পরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়। আবৃত্তিশেষে শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক গানই ছিল এ পর্যায়ের মূল আকর্ষণ।

বিকেলে আয়োজন করা হয়েছিল আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মুহম্মদ সামাদ। বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী মাতৃভাষা দিবসের ওপর আলোচনা করে। আলোচনার শেষে ছিল পুরস্কার বিতরণ পর্ব। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কবিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান অতিথি। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদকের নাম : সৈকত
প্রতিবেদনের শিরোনাম : 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন।
প্রতিবেদনের প্রক্রিয়া : বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের সময় : দুপুর ১২টা
প্রতিবেদনের তারিখ : ২৩/০২/২০২...

৫. খ.

সড়কের বেহাল দশা : যাত্রীদের দুর্ভোগ

সুমনা, বরিশাল প্রতিনিধি, ২২শে জুলাই ২০২...॥ বরিশাল সদর উপজেলা থেকে গৌরনদী উপজেলা সড়কটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে সড়কটির কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। সড়কের এ বেহাল দশায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, দীর্ঘ সড়কটির পুরোটাই বড়ো বড়ো গর্ত ও খানাখন্দে ভরা। এমনকি দুই পাশের মাটি সরে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে হাজার হাজার মানুষ চলাচল করে। এছাড়া কমপক্ষে ত্রিশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পথে যাতায়াত করে থাকে। এলাকাবাসী জানান, সড়কটির সুরকির স্তর দেবে গিয়ে বালু বের হয়ে আসে এবং সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। এরপর প্রতি বর্ষায় বৃষ্টিপাতে পানি ও কাদায় সড়কটি একাকার হয়ে যায়, যা এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি পিকআপ ভ্যান রাস্তার গর্তে পড়ে যায়। এতে চালকসহ তিন জন যাত্রী আহত হন।

সাধারণ মানুষ মনে করে, সড়কটি নিয়ে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। অথচ এর সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এটি মেরামতের জন্য স্থানীয় লোকজন সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনো প্রতিকার পায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৬. ক. **ভূমিকা :** জীবনে শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নিয়মের অনুবর্তী হয়ে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাই শৃঙ্খলা। আর শৃঙ্খলাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ এবং তা চর্চার মধ্য দিয়েই জন্ম হয় শৃঙ্খলাবোধের। এটি জীবনের সবকিছুকেই সার্থক করতে সহায়ক

ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবোধ শান্তিময় স্বাভাবিক জীবন বয়ে আনতে সহায়তা করে।

শৃঙ্খলা কী : সাধারণত নিয়ম-কানুনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং তার অনুসরণ করাই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলাবোধ শুধু রাষ্ট্রীয় কিছু বিধিনিষেধকে গ্রহণ বা বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অলিখিত কিছু রীতি আছে, যা মানুষকে মেনে চলতে হয়। জগতের সকল কাজের সাথেই শৃঙ্খলা জড়িত, এমনকি বিশ্বজগতের বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যেও শৃঙ্খলার বিষয়টি স্পষ্ট। ঘরে, বাইরে, রাষ্ট্রে যেখানেই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হয়েছে সেখানেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতির রাজত্বে শৃঙ্খলা : শৃঙ্খলাবোধ মানবজীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বিশ্বপ্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিদ্যমান। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা সবকিছুই চলছে নিয়মের মধ্য দিয়ে। এভাবে নিয়মকে অনুসরণ করছে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র। পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামে, ঝরনা মিলিত হয় নদীতে আর নদী ছোটে সমুদ্রের পানে। নদীর জলে জোয়ার আসে, আসে ভাটাও। বর্ষা আসে, শীত আসে, আসে বসন্ত। পৃথিবী আঁধার করা অমাবস্যা কালো পর্দা টেনে দেয় জগৎ সংসারে। পৃথিবীর সবকিছুকে যেন আড়াল করে দেয়। আবার পূর্ণিমা আসে। কোমল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গোটা জগৎ। এ সবই নিয়মশৃঙ্খলাকে মান্য করেই ঘটছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই ছন্দপতন ঘটবে পৃথিবীর। মানুষও স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে ফেলবে। শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যে প্রাণিজগতেও আছে শৃঙ্খলা। তাদের আহার, বিহার, বাসস্থান সবকিছুতে যদি শৃঙ্খলা না থাকত তাহলে বনের প্রাণীরা নেমে আসত হাট-বাজারে, পাখিরা গান গাইত অন্য কোনো স্থানে।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ : ছাত্রজীবনে মানুষ যা কিছু শেখে, যা কিছু অর্জন করে এর প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায়। শৃঙ্খলাবোধ মানুষকে সুনিয়মে চালিত করে বলে ছাত্রজীবনে এর চর্চা থাকলে কোনো ছাত্রের জীবনেই অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে না। কিন্তু যে ছাত্র নিয়ম পালন করে না তার পক্ষে যথাসময়ে যথা কাজ করা অসম্ভব। ফলে পিছিয়ে যেতে যেতে ছাত্রের মনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণার জন্ম হয়। সে উদ্যম হারিয়ে নিজের জীবনকে অর্থহীন করে তোলে, এমনকি বিপথগামী হওয়াও তার পক্ষে সহজ। শৃঙ্খলা নেই এমন ছাত্র ছাত্রমহলে এবং শিক্ষকমহলে সমাদৃত হয় না। অন্যদিকে শৃঙ্খলাবোধে উজ্জীবিত ছাত্র শিক্ষকের স্নেহ আনুকূল্য লাভ করে জীবনকে উন্নত করার সুযোগ পায়। তাই ছাত্রজীবনেই শৃঙ্খলাবোধে জাগ্রত হওয়া অত্যাবশ্যক।

সমাজ ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা : মানুষের সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন। একটি সমাজে শৃঙ্খলা না থাকলে এর সুন্দর কাঠামোটি ভেঙে যায়। সমাজজীবনে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে একটি উচ্ছৃঙ্খল গোত্রের আবির্ভাব হতে পারে। এর ফলে সমাজে অত্যাচার, লুণ্ঠন এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, সেখানে যে কেউ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের মানুষের ওপর ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ঘটে। আর এ কারণেই সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই সমাজজীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এভাবে জাতীয় জীবনেও রয়েছে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মধ্যে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর অকার্যকর রাষ্ট্র মানেই অরাজকতা এবং সীমাহীন দুর্নীতি। শৃঙ্খলাপূর্ণ জাতি খুব দ্রুত উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। শৃঙ্খলাকে সভ্য সমাজের একটি লক্ষণ বলা যেতে পারে। তাই জাতির জাতীয় অগ্রগতির প্রয়োজনে এবং সভ্য সমাজের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের সকলেরই নিয়ম শৃঙ্খলাকে জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : মানবজীবনকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে চাই অনুকূল পরিবেশ। আর শৃঙ্খলা জীবনে বয়ে আনে সে অনুকূল পরিবেশ। শৃঙ্খলাবোধ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় সুন্দর আগামীর দিকে। শৃঙ্খলার গুরুত্বটি অনুধাবন সহজ হয় সৈনিক জীবনের দিকে

তাকালেই। বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করতে গিয়ে কঠোরভাবে মেনে চলে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে যুদ্ধের মাঠে পরাজয় অবধারিত হয়ে যায়। তাই সৈনিকজীবনের উদয়াস্ত সমস্তই শৃঙ্খলাপূর্ণ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো প্রভূত উন্নতি করছে শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করে। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম : শৃঙ্খলাবোধ সবারই কাম্য। আর শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম অশান্তি। যে সমাজ শৃঙ্খলাবর্জিত সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।। শৃঙ্খলা নেই এমন সমাজে যে কেউ আইনকে তার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। ফলে দুর্বল মার খায় সবলের হাতে। সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের জন্য অশান্তি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই শৃঙ্খলার চর্চা নেই। যে কারণে যুগ যুগ ধরে উন্নতির চেষ্টা করেও তারা উন্নতির সাক্ষাৎ পাচ্ছে না; বরং দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে চরমপন্থিদের বিদ্রোহ। শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য নেই বলেই আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অনেক দেশের অর্ধেক শাসনভার সরকারের হাতে, অন্য অর্ধেক বিদ্রোহী চরমপন্থিদের হাতে। এ পরিস্থিতি কল্যাণ রাষ্ট্রের সভ্য জাতির লক্ষণ হতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের উচিত নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হলে তার উপযুক্ত তদারকি করা। আর আইন শৃঙ্খলা অমান্যকারীদের আইনের আওতায় আনতে পারলেই জাতি ভয়াল পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে।

উপসংহার : শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণে সুনাগরিকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবনকে সাফল্যে ভরে দিতে শৃঙ্খলা অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সুনাগরিকের ব্যক্তিসাফল্য বৃহৎ অর্থে জাতীয় সাফল্যের নামান্তর। তাই জাতীয় জীবনে অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন সুনাগরিক অত্যাবশ্যক।

৬. খ. ভূমিকা : সভ্যতার ক্রম পরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানবসভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।

৬. গ. **ভূমিকা :** মাদকাসক্তি আমাদের সমাজের ভয়াবহ একটি সমস্যা। কিছু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষ নিজেকে মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। একটি জাতির উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করে তরুণসমাজ। কিন্তু মাদক তরুণসমাজের সেই অদম্য কর্মপ্রেরণাকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে নিজেকে যেমন ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তেমনি দেশকেও মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাই এর প্রতিকার করা অত্যাবশ্যক।

মাদকের আবির্ভাব বা উৎস : নেশার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মদ, গাঁজা, আফিম, চরস বা তামাকের কথা বহু আগে থেকেই মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে মাদকের ব্যবহার শুরু হয়, যাকে ইংরেজিতে ড্রাগ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের ব্যথার উপশম হিসেবে ড্রাগের ব্যবহার হলেও পরে হতাশা কাটাতেও তারা ড্রাগ ব্যবহার করতো। এরপর থেকেই কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশে নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ড্রাগের ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীব্যাপী।

মাদকদ্রব্যের প্রকারভেদ : সমাজে নানা ধরনের মাদকদ্রব্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– হেরোইন, প্যাথেড্রিন, এলএসডি, মারিজুয়ানা, কোকেন, হাসিস প্রভৃতি আধুনিককালের মাদকদ্রব্য; তবে এর মধ্যে হেরোইন ও কোকেন বেশ দামি। আমাদের দেশের যুবসমাজ সচরাচর যে মাদকদ্রব্যগুলো ব্যবহার করে সেগুলো হলো– সিডাকসিন, ইনকটিন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, ডেক্সপোটেন, গাঁজা ইত্যাদি। তবে এ সবকিছুর ব্যবহারকে ছাড়িয়ে গেছে অত্যাধুনিক এক মাদক যার নাম ইয়াবা।

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার : দেশে মাদকের ব্যবহার বহু বিচিত্র। মানুষ নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ করতে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। মাদকের ব্যবহার করে সে কল্পনার জগতে বিচরণ করে। এক্ষেত্রে মাদক ব্যবহারকারীরা নানা ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে। যেমন– ধূমপান, ইনহেল বা শ্বাসের মাধ্যমে, জিহ্বার নিচে গ্রহণের মাধ্যমে, সরাসরি সেবনের মাধ্যমে, স্কিন পপিং ও মেইন লাইনিংয়ের মাধ্যমে। তবে যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন তাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো নেশায় উন্মত্ত হওয়া। প্রথমে কৌতূহলের বশে অনেকেই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে অভ্যস্ত হয়ে ভয়াবহ এক সর্বনাশের পথে এগিয়ে যায় তারা।

মাদকাসক্তির কারণ : এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ ব্যক্তিজীবনের হতাশা। মানুষ যখন জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়ে, তখন সে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয়। হতাশাগ্রস্ত সাধারণ তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের হারও অনেক বেশি। তাছাড়া অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হয়েও অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। যেসব পরিবারে পারিবারিক অশান্তি অনেক বেশি, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের জীবন বিশৃঙ্খল হতে থাকে। তারা এই বিশৃঙ্খলা থেকে ধীরে ধীরে মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরা প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় এ ধরনের অনেক ঘটনাই লক্ষ করি। বেশির ভাগ মাদকসেবী দেখা যায় যারা বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীর সংস্পর্শে মাদকে আসক্ত হয়, তবে পারিবারিক অশান্তিই মাদকাসক্তির বিশেষ কারণ হিসেবে দেখা যায়।

মাদক চোরাচালান : সাধারণত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদক চোরাচালান হয়। সীমান্তে স্থল বা জলপথে এবং আকাশপথে বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ মাদক চোরাচালান নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে যার পেছনে রয়েছে বিরাট এক সিন্ডিকেট। কিছুকাল আগেও মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের 'স্বর্গভূমি'। তবে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই নেটওয়ার্ক ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পরেই চোরাচালানকারীরা ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে গড়ে তোলে ড্রাগ পাচারের নতুন ভিত্তিভূমি, যার নাম 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'।

বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন : বাংলাদেশে মাদকের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা এই মাদক আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মায়ানমার থেকে অবাধে এদেশে প্রবেশ করছে ইয়াবা, যাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে বহু তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতি। দর্শনার 'কেরু এন্ড কোম্পানি' এদেশের একমাত্র লাইসেন্সধারী মদ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তার বাইরে বহু বিদেশি কোম্পানির মদ অবৈধভাবে অবাধে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গাঁজা ও আফিমের মতো মাদকদ্রব্যও অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতা : মাদকাসক্তিকে অপ্রতিরোধ্য রোগ এইডসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাদকাসক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ইয়াবা ও হেরোইনের মতো মাদকদ্রব্য মানুষের শরীরের সমস্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এর আসক্তিতে মানুষ এক অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে। নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ জীবনে ফিরে আসাও খুব সহজ হয় না। শরীরে মাদক গ্রহণ বন্ধ করা মাত্রই 'উইথড্রয়াল সিমটম' শুরু হয়। তখন মাদক না পেলে শুরু হয় টার্কি পিরিয়ড; হাত পা কাঁপতে থাকে; অসম্ভব শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তা হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে। তখন সুচিকিৎসা না পেলে খুব অল্প সময়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ : বিশ্বজুড়ে যে মাদকবিষ ছড়িয়ে পড়ছে তার থাবা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সমাজসেবীরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দেশে দেশে নানা সংস্থা ও সংগঠন মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। আমাদের দেশেও মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যম মাদকবিরোধী জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে :

১. মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভেষজ ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ,
২. সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নেশার হাতছানি থেকে তাদের দূরে রাখা,
৩. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মাদকাসক্তির মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা,
৪. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা,
৫. বেকার যুবকদের জন্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

উপসংহার : মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যায় তরুণরাই বেশি আসক্ত। একটি দেশের গতিশীলতাকে অব্যাহত রাখে তরুণসমাজ। তারাই যদি মাদকের কবলে পড়ে নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, তবে দেশের সার্বিক অগ্রগতি চরমভাবে বিনষ্ট হবে। তাই তরুণসমাজকে মাদক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এর কারবারিদের সর্বাগ্রে বয়কট করতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা বাংলাদেশ মাদকমুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হোক।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. শব্দদ্বিত্ব কয় ধরনের?
ⓚ দুই ⓚ তিন
ⓖ চার ⓖ পাঁচ

২. কোনটি ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ?
ক) একাদশ খ) সপ্তমী
গ) চৌঠা ঘ) চার

৩. 'দোকান' কোন ভাষার শব্দ?
ক) আরবি খ) ফারসি
গ) পর্তুগিজ ঘ) তুর্কি

৪. 'গুরুত্ব' কোন পদ?
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ
গ) অব্যয় ঘ) ক্রিয়া

৫. কোনটি সকলবাচক সর্বনাম?
ক) কিছু খ) পরস্পর
গ) সবাই ঘ) আপনারা

৬. চলন্ত' কোন ধরনের বিশেষণ?
ক) অবস্থাবাচক খ) গুণবাচক
গ) পূরণবাচক ঘ) ভাববাচক

৭. রাখাল গোরুকে ঘাস খাওয়ায়। এই বাক্যে 'খাওয়ায়' কোন ধরনের ক্রিয়া?
ক) যৌগিক খ) সরল
গ) প্রযোজক ঘ) সংযোগ

৮. মিছিলটি সামনে এগিয়ে যায়। এখানে 'সামনে' কোন ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ?
ক) নেতিবাচক খ) কালবাচক
গ) ধরনবাচক ঘ) স্থানবাচক

৯. আরে! তুমি আবার কখন এলে?
ক) আতঙ্ক খ) বিস্ময় গ) বিরক্তি ঘ) করুণা

১০. "বিপদ ও দুঃখ একসঙ্গো আসে।"– কোন ধরনের বাক্য?
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক ঘ) মিশ্র

১১. শুধু মানুষের বেলায় কোন নির্দেশক ব্যবহৃত হয়?
ক) জন খ) গুলো গ) টা ঘ) টি

১২. সাধারণত ক্রিয়ার কাল, স্থান ও ভাব বোঝাতে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?
ক) এ, তে খ) র, এর
গ) কে, রে ঘ) এ, য়ের

১৩. ক্রিয়ার প্রথম অংশকে কী বলে?
ক) ক্রিয়াবিভক্তি খ) ধাতু
গ) শব্দমূল ঘ) শব্দ

১৪. বাক্যের ক্রিয়াকে যে চালায় তাকে কী বলে?
ক) কর্তা খ) কর্ম
গ) ক্রিয়া ঘ) পদ

১৫. বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে কী বলে?
ক) বিধেয় খ) পূরক
গ) উদ্দেশ্য ঘ) প্রসারক

১৬. কাপটা উঁচু টেবিল থেকে পড়ে ভেঙে গেল। বাক্যে 'উঁচু টেবিল থেকে' কোন কারক?
ক) করণ খ) অপাদান গ) অধিকরণ ঘ) কর্ম

১৭. আমার যাওয়া হলো না। বাক্যটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?
ক) ভাববাচ্য খ) কর্মবাচ্য
গ) কর্ম-কতৃবাচ্য ঘ) কর্তাবাচ্য

১৮. 'অপরূপ' শব্দটির মধ্যে কোন ধরনের অর্থ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়?
ক) অর্থ-প্রসার খ) অর্থ-বদল
গ) অর্থের উন্নতি ঘ) অর্থের অবনতি

১৯. আমি এখনই বের হচ্ছি– এর পরোক্ষ উক্তি কোনটি?
ক) আমি তখনই বের হব। খ) সে তখনই বের হচ্ছে।
গ) সে এখনই বের হচ্ছে। ঘ) আমি এখনই বের হচ্ছি।

২০. 'ভাগ্যের খেলা' অর্থ কোন বাগ্‌ধারার মধ্যে রয়েছে?
ক) ভরাডুবি খ) পটল তোলা
গ) অমাবস্যার চাঁদ ঘ) অদৃষ্টের পরিহাস

২১. 'ইচ্ছা' শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ কোনটি?
ক) আকাঙ্ক্ষা খ) হর্ষ
গ) পিপাসা ঘ) কৃপা

২২. 'বন্ধন'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি সঠিক?
ক) মুক্তি খ) পুরস্কার
গ) প্রশংসা ঘ) যুক্তি

২৩. কোনটি বাগ্‌যন্ত্র?
ক) নাক খ) কান
গ) গলা ঘ) মাথা

২৪. ধ্বনির প্রতীককে কী বলা হয়?
ক) ভাষা খ) বাক্য গ) বর্ণ ঘ) শব্দ

২৫. 'চাই' শব্দের মধ্যে কোন কোন স্বরধ্বনি আছে?
ক) আ + ই খ) আ + এ
গ) অ + ই ঘ) অ + এ

২৬. কোনটি ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ?
ক) র খ) ঠ গ) দ ঘ) ভ

২৭. কোন শব্দে বিপরীত অর্থে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) কদবেল খ) গরহাজির
গ) উপভোগ ঘ) নিমরাজি

২৮. শব্দ ও ধাতুর পরে অর্থহীন যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয় সেগুলোকে কী বলে?
ক) উপসর্গ খ) অনুসর্গ
গ) যোজক ঘ) প্রত্যয়

২৯. 'আলুসিদ্ধ' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) কর্মধারয় খ) তৎপুরুষ
গ) অব্যয়ীভাব ঘ) বহুব্রীহি

৩০. 'জনৈক' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) জন + ইক খ) জনা + ইক
গ) জন + এক ঘ) জনা + এক

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) বৈশাখী মেলা

(খ) স্বাধীনতা দিবস

২। (ক) মনে করো তুমি প্রত্যয়/প্রজ্ঞা। তুমি ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার অধিবাসী। তোমার এলাকায় একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো। ১০

অথবা,

(খ) সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিকারের দাবি জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

অভাব আছে বলিয়া জগৎ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। অভাব না থাকিলে জীব-সৃষ্টি বৃথা হইত। অভাব আছে বলিয়া অভাব পূরণে এত উদ্যম, এত উদ্যোগ। সংসার অভাবক্ষেত্র বলিয়া কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলেই স্থানু-স্থবির হইত, মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনাময় হইত। মহাজ্ঞানীগণ অপরের অভাব দূর করিতে সর্বদা ব্যস্ত। জগতে অভাব আছে বলিয়াই মানুষ সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সেবা মানবজীবনের পরম ধর্ম। সুতরাং অভাব হইতেই সেবাধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। আর এই সেবাধর্মের দ্বারাই মানুষের মনুষ্যত্বসুলভ গুণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা।

৪। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে।

অথবা,

(খ) মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে,
হারা শশীর হারা হাসি, অন্ধকারেই ফিরে আসে।

৫। (ক) মনে করো, তুমি এহসান। তোমার বিদ্যালয়ে ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উদ্‌যাপন সম্পর্কিত একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রণয়ন করো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি তুবা। তুমি ‘দৈনিক প্রথম আলো’ পত্রিকার একজন নিজস্ব সংবাদদাতা। সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা বিষয়ক একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) অদম্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

(খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

(গ) বাংলাদেশের উৎসব।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ⓚ	২	ঘ	৩	খ	৪	ক	৫	গ	৬	ক	৭	খ	৮	ঘ	৯	খ	১০	গ	১১	ক	১২	ক	১৩	খ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	ঘ	২১	ক	২২	ক	২৩	ক	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	গ

রচনামূলক

১. ক. নববর্ষকে উৎসবমুখর করে তোলে বৈশাখী মেলা। এটি মূলত সর্বজনীন লোকজ মেলা। এ মেলা অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে হয়ে থাকে। মেলার বিচিত্র আনন্দ-অনুষ্ঠানে, কেনাবেচার বাণিজ্যিক লেনদেনে, মিলনের অমলিন খুশিতে, অবারিত অন্তর প্রীতির স্পর্শে মেলার দিনটি মুখর হয়ে ওঠে। বৈশাখী মেলার প্রথম দিনেই শুরু হয় ব্যবসায়ীদের হালখাতার শুভ মহরত। প্রতিটি বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানেই ক্রেতাদের মিষ্টান্ন সহযোগে আপ্যায়ন করা হয়। সর্বত্রই এক মধুর প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ। বৈশাখী মেলা একদিন থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। এ মেলায় স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য, কারুপণ্য, লোকশিল্পজাত পণ্য, কুটির শিল্পজাত সামগ্রী, সর্বপ্রকার হস্তশিল্পজাত ও মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী, রন্ধনশিল্পজাত সামগ্রী, ফার্নিচারসহ নিত্যব্যবহার্য আধুনিক সবধরনের সামগ্রী পাওয়া যায়। এছাড়া শিশু-কিশোরদের খেলনা, মহিলাদের সাজসজ্জার সামগ্রী এবং বিভিন্ন লোকজ খাদ্যদ্রব্য; যেমন– চিড়া, মুড়ি, খই, বাতাসা ইত্যাদি, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি প্রভৃতির বৈচিত্র্যময় সমারোহ থাকে। মেলায় বিনোদনেরও ব্যবস্থা থাকে। মেলায় অনুষ্ঠিত হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগায়ক ও লোকনর্তকদের উপস্থিতি থাকে। তাঁরা যাত্রা, পালাগান, কবিগান, জারিগান, গম্ভীরা গান, গাজির গানসহ বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত, বাউল-মারফতি-মুর্শিদি-ভাটিয়ালি ইত্যাদি বিভিন্ন আঞ্চলিক গান পরিবেশন করেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নাটক, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, সার্কাস ইত্যাদি মেলার বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া শিশু-কিশোরদের আকর্ষণের জন্য থাকে বায়োস্কোপ। শহরাঞ্চলে নগর সংস্কৃতির আমেজে এখনো বৈশাখী মেলা বসে এবং এ মেলা বাঙালিদের কাছে এক অনাবিল মিলনমেলায় পরিণত হয়। বৈশাখী মেলা বাঙালির আনন্দঘন লোকায়ত সংস্কৃতির ধারক। এ মেলা নিছক একটি আনন্দানুষ্ঠান মাত্র নয়; এটি বাঙালির স্বকীয় ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পরিচায়কও বটে।

১. খ. ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। এটা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা **১৯৭১**-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ সত্ত্বেও স্বৈরাচার পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় এদেশের জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পাক-সরকার জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে **১৯৭১** সালের **২৫**শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকহানাদার বাহিনী কামান, গুলি, ট্যাংক নিয়ে ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। এরই প্রেক্ষিতে **২৬**শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত যুদ্ধের পর **১৯৭১** সালের **১৬**ই ডিসেম্বর ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। **১৯৭২** সালের **২৬**শে মার্চ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর এ দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সব ভবনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়। ভোরবেলা গণজমায়েত হয় বিভিন্ন প্রাঙ্গণে, শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং রেডিও-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এভাবে সমগ্র দেশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে দিবসটি অত্যন্ত গৌরবের ও মর্যাদার।

২. ক. ৫ই জুন, ২০২...
বরাবর
চেয়ারম্যান
ত্রিশাল ইউনিয়ন পরিষদ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
বিষয় : পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।
জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত ত্রিশাল ইউনিয়ন পরিষদের অধিবাসী। আমাদের গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। গ্রামে শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে একটি বড়ো গ্রাম্য বাজার ও নানা ছোটো শিল্প কারখানা, স্কুল, মাদরাসা, একটি ক্লাবঘর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, জ্ঞানপিপাসু ছেলেমেয়েদের জ্ঞানপিপাসা মেটানোর জন্য উক্ত অঞ্চলে বা তার আশেপাশে কোনো পাঠাগার নেই। ফলে জ্ঞানার্জন তথা শিল্পসাহিত্যে সময় ব্যয় করার মতো কোনো মাধ্যম নেই। গ্রামে উঠতি বয়সি যুবক ছেলেরা নানা রকম আড্ডাবাজিতে সময় নষ্ট করে। এতে কেউ কেউ বিপথগামীও হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইতঃপূর্বে এ ব্যাপারে কয়েকবার আবেদন নিবেদন করেও কোনোপ্রকার সাড়া পাওয়া যায়নি।
এমতাবস্থায়, মহোদয়ের কাছে বিনীত অনুরোধ যে, এই গ্রামের বাজারে একটি পাঠাগার স্থাপন করে বাধিত করবেন।
নিবেদক
গ্রামবাসীর পক্ষে
প্রত্যয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

২. খ. ১৩ই মে, ২০২...
বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক সমকাল,
৩৮৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশের আবেদন।
জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক সমকাল'-এ চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত থাকব।
বিনীত
সুমনা
ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিকার চাই

'একটি দুর্ঘটনা, সারা জীবনের কান্না'– স্লোগানটি নির্মম বাস্তবতানির্ভর। ইদানীং সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই সংঘটিত হচ্ছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে একটি না একটি সড়ক দুর্ঘটনার খবর চোখে পড়ে। এ ধরনের দুর্ঘটনা যেন দিন দিন বেড়েই চলছে, যার ফলে বহু পরিবার সর্বনাশের সম্মুখীন হচ্ছে। কত মা-বাবা তার সন্তান হারিয়েছে। কত সদ্যবিবাহিতাকে বিধবা-জীবন বরণ করতে হচ্ছে। কত পিতাকে যে পুত্রের লাশ বহন করতে হচ্ছে। দিন দিন মানুষের জীবন অনিরাপদ হয়ে পড়ছে। একথা সত্য যে, 'জন্মিলে মরিতে হবে।' কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে মেনে নেওয়া যায় না।

সাধারণত আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কয়েকটি কারণ হলো– ত্রুটিযুক্ত গাড়ি, অনভিজ্ঞ বা মাদকাসক্ত ড্রাইভার, ধারণ ক্ষমতার অধিক মাল বা যাত্রী বহন, ওভারটেকিং বা চালকের দায়িত্বহীনতা, ট্র্যাফিক আইন না মানার প্রবণতা ইত্যাদি। এসব সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন– পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সবাইকে যানবাহন বিধি ও আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া, রাস্তা সংস্কার, ট্র্যাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মিডিয়াগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

আশা করি, উপরিউক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।
নিবেদক
সুমনা

৩. ক. জীবনে অসম্পূর্ণতা আছে বলেই মানুষ পূর্ণতার খোঁজ করে। অভাব দূর করার জন্যই সে কর্মপ্রচেষ্টায় রত থাকে। আবার কিছু মানুষ অন্যের অভাব পূরণের মধ্য দিয়ে মহান হয়ে ওঠে।

৩. খ. নবীনের কর্মচঞ্চলতায় পৃথিবী নতুন রূপে সাজে। যারা পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রাখে, তারা পরিবর্তনকে ভয় পায়। তারুণ্যের প্রাণশক্তিতে সবাইকে উজ্জীবিত হতে হবে।

৪. ক. ব্যক্তির জীবনাচরণের মধ্যে যা নেই, তা পালনের জন্য অন্যকে উপদেশ দেওয়া যায় না। অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে তা পালন করে দেখাতে হয়। এর ফলে যাকে উপদেশ দেওয়া হয়, সে তা পালন করতে আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়।
কাউকে উপদেশ দেওয়া যত সহজ, উপদেশ পালন করা তার চেয়ে অনেক কঠিন। যে উপদেশ দেয়, সে যদি নিজে তা পালন না করে, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে এর গুরুত্ব থাকে না। অন্যদিকে উপদেশ দানকারী যদি সেই উপদেশের পালনীয় দিক নিজ জীবনে পালন করে দেখান, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশ পালনের দৃষ্টান্ত পেয়ে যান, যা তার জীবনাচরণে প্রভাব ফেলে। সাধারণত ধর্মপ্রবর্তক, ধর্মপ্রচারক, জ্ঞানী ব্যক্তি বা জীবনে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তদের তরফ থেকে উপদেশ-বাণী বর্ষিত হয়ে থাকে। এঁদের দেওয়া উপদেশ মানুষ পালন করতে দ্বিধা করে না। তবে উপদেশ হিসেবে বর্ষিত কথাটুকু তাঁরা নিজেদের জীবনেও অনুসরণ করেন কি না– এ বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক থাকতে হয়। সমাজে অনেক মানুষ থাকে, যারা উপদেশ দিতে খুব পটু, কিন্তু ওইসব উপদেশ তারা নিজেরাই পালন করতে অভ্যস্ত নয়। তখন উপদেশগুলো উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে সেইভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একজন লোক নিয়মিত ধূমপান করে, আবার সে যদি অন্যকে ধূমপান করতে নিষেধ করে, তাহলে তা হাস্যকর উপদেশে পরিণত হয়। তাই কোনো একটা ভালো কাজ করতে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার আগে উপদেশদাতাকেই ভালো কাজটি করতে অভ্যস্ত হতে হবে। তাতে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশের পাশাপাশি উপদেশ পালনের নজিরও গ্রহণ করতে পারে।
কাউকে উপদেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে ভালো মানুষ সাজার ভান করা খুব সহজ, কিন্তু উপদেশ পালন করা খুব কঠিন কাজ। তবে সেই উপদেশদাতাই সর্বোত্তম, যিনি নিজে যা পালন করেন, অন্যকেও তা পালন করতে বলেন।

৪. খ. হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন। দুঃখের সময় ভেঙে পড়লে চলবে না। কেননা দুঃখের পরেই আসে সুখ। দুঃখের পাশাপাশি সুখ আসবে এটাই স্বাভাবিক।

জগৎ সংসারে মানুষ সর্বদাই সুখের কাঙাল, মানুষের প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তই সুখের হয়ে উঠুক এটাই প্রার্থিত। দুঃখকে পরিহার করার সংগ্রামেই মানুষ প্রতিনিয়ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুখ অর্জনের জন্য কষ্টের প্রয়োজন। আর এই কষ্টই হলো দুঃখকে বরণ করে নেওয়া। আর এ দুঃখের রজনী যতই গভীর হয় সুখের অভ্যুদয় ততই নিকটবর্তী হয়ে আসে। পতঙ্গ আনন্দ বিহারে যতই ঊর্ধ্ব গগনে উড়তে থাকে, ততই এর পতনের মুহূর্ত নিকটবর্তী হতে থাকে। দুঃখের রাত্রি পার হয়েই আসে আনন্দঘন সুপ্রভাত। সুখ মানুষকে আনন্দ দেয়। তাই সুখের প্রতিই তার পক্ষপাতিত্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুঃখ হতেও যে অমৃত লাভ করা যায়, মানুষ তা অনুভব করে না। বাস্তব জীবনেও দুঃখ কষ্টের প্রয়োজন আছে। মাতৃস্নেহের

মূল্য দুঃখে, পতিব্রতের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়েই মানুষের চিত্ত শুচিশুভ্র হয়ে ওঠে, মানুষ নতুনতর মহিমান্বিত জীবন লাভ করে। সুতরাং দুঃখের পথ বেয়েই আসে সুখ শান্তির আয়োজন। মেঘ যতই গভীর ও ঘনতর হয়ে আসুক না কেন, সূর্যকে গ্রাস করবার বা অবলুপ্ত করবার মতো ক্ষমতা তার নেই। মেঘ সব সময় থাকে না। মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য হেসে উঠবেই। পতনোন্মুখ তরঙ্গও আবার পরক্ষণে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। অমাবস্যার যে অন্ধকার চাঁদকে সাময়িকভাবে গ্রাস করেছে তার পরদিনই হেসে ওঠে নতুন চাঁদ। শীত চিরস্থায়ী নয়। শীতের পর বসন্ত আসবেই।

সুতরাং মানুষকে দুঃখরূপ কালো মেঘের ঘনঘটায় ভেঙে পড়লে চলবে না, বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসে তার মোকাবিলা করতেই হবে। মনে রাখতে হবে, দুঃখের কালো মেঘ কেটে এক সময় সুখের সোনালি সূর্য হেসে উঠবেই।

৫. ক. ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২...

মাননীয়
প্রধান শিক্ষক,
সিলেট জিলা স্কুল, সিলেট।

বিষয় : 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন।

জনাব,

আপনার প্রদত্ত ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২...; স্মারক নং সজস– ২২/২০২... পত্রের আদেশক্রমে বিদ্যালয়ে 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য প্রদত্ত হলো।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সিলেট জিলা স্কুলে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২... দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব জসিম উদ্দিন।

সকাল ৭টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভোর থেকেই বিদ্যালয়ের আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা খালি পায়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করেন। বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের খালি পায়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারির অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয় শোভাযাত্রা। অবশেষে সকাল ৮টায় শহিদ মিনারের পাদদেশে সকলে উপনীত হলে প্রধান শিক্ষক প্রথম পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অমর শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ফুলের তোড়া শহিদ মিনারে অর্পণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

শহিদ দিবস ও মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচি ছিল কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। শহিদ মিনারের বেদিমূলে সবুজ ঘাসের গালিচার উপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিগণের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। পরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়। আবৃত্তিশেষে শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক গানই ছিল এ পর্যায়ের মূল আকর্ষণ।

বিকেলে আয়োজন করা হয়েছিল আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মুহম্মদ সামাদ। বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী মাতৃভাষা দিবসের ওপর আলোচনা করে। আলোচনার শেষে ছিল পুরস্কার বিতরণ পর্ব। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কবিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান অতিথি। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদকের নাম	:	এহসান
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন।
প্রতিবেদনের প্রক্রিয়া	:	বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের সময়	:	দুপুর ১২টা
প্রতিবেদনের তারিখ	:	২৩/০২/২০২...

৫. খ.

চারুকলায় সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা

তুবা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, ঢাকা, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২...... ॥

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। সকাল নয়টায় অনুষদ প্রাঙ্গণের বকুলতলায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। নির্দিষ্ট রচনা থেকে লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। দুটি বিভাগে ছিল এ আয়োজন– বাংলা ও ইংরেজি। বিকালে ছিল পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতি বিভাগে তিন জন করে মোট ছয় জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন এই চারুকলা অনুষদের শিক্ষক অধ্যাপক মুকুল কুমার মিত্র, ড. আয়শা সুলতানা ও ড. আফজাল হোসেন খান। জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সংস্কৃতিকর্মী জনাব ফজলুল হক। এরপর চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক পর্ব উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শক ও অতিথিবৃন্দ।

৬. ক. **ভূমিকা :** বাংলাদেশের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। যোগ্য নেতৃত্ব, যথাযথ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তৃতি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শক্তিশালী বাজার পরিকল্পনা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশ যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা নজিরবিহীন।

অর্থনৈতিক সূচকে বাংলাদেশ : ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় উৎপাদন প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) হার ছিল ৫.৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার (প্রায় ৪৫,০০০ টাকা)। অথচ ২০১৮–২০১৯ অর্থবছরে এই হার ৮.১৩ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১৯০৯ মার্কিন ডলার (প্রায় ১,৬১,০০০ হাজার টাকা)। শুধু মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তা-ই নয়,বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু। বাজেটের আকার রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজেট বাস্তবায়নে কমছে পরনির্ভরতা। সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্যের হার নিম্নমুখী। বর্তমান সময়ে দারিদ্র্যের হার ১৪ শতাংশেরও কম; আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় অবস্থানে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের যে-কোনো সূচকের বিচারে বাংলাদেশের অগ্রগতি অভূতপূর্ব।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন : একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার দৃশ্যমান দিক হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এর মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও জীবনমানের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। গত এক দশকে বাংলাদেশের এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। বড়ো বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই চালু হবে বাংলাদেশের জনমানুষের বহুকাঙ্ক্ষিত পদ্মাসেতু। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণের সফলতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে একটি মাইলফলক। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশে ছোটো-বড়ো অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব অবকাঠামো যথাসময়ে সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আরও এগিয়ে যাবে। এছাড়া সড়ক নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন ভবন নির্মাণও বর্তমানে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানিকে সামনে রেখে পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল হবে, রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বাড়বে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন : প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করে তুলছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে 'ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ' স্থাপন করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলাকে ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনা হয়েছে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ কোটির অধিক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। থ্রি-জি ও ফোর-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটাইলাইট-১ উৎক্ষেপণ বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে যুগান্তকারী ঘটনা। এটি বাংলাদেশের নিজস্ব সম্প্রচার উপগ্রহ। ২০১৮ সালের ১১ই মে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি ও তথ্যের মাধ্যমে দেশের সম্প্রচার কার্যক্রম সমৃদ্ধ হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন : বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে। সর্বস্তরে শিক্ষাকার্যক্রম নিশ্চিত করার ফলে একটি কর্মক্ষম দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে উঠছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। দেশে ও দেশের বাইরে উভয় ক্ষেত্রে তাদের কর্মসংস্থানের অনেক ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে। কৃষিশিল্প, পোশাকশিল্প, ঔষধশিল্পসহ প্রতিটি শিল্পখাতের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও বেড়েছে। চাকরি নির্ভরতা কমেছে; উদ্যোক্তার সংখ্যা বেড়েছে। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিতে শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত এক দশকে শুধু তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১০ লাখ মানুষের। বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লাখের অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। তারা নিয়মিত তাদের কষ্টে উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় মানবসম্পদ এভাবে সবচেয়ে বড়ো প্রভাবক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির আকার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমন বিস্তৃত হয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক পণ্য রপ্তানি আয়ে অর্জিত হয়েছে মাইলফলক। ২০১৮–২০১৯ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি হয়েছে চার হাজার কোটি মার্কিন ডলার, যা এখন পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ পণ্য রপ্তানি আয়।

প্রতিবন্ধকতা : ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে প্রথমবারের মতো আটকে দেওয়ার চক্রান্ত হয়। এরপর বহু বছর ধরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়ে। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের অগ্রগতি ছিল ধীরগতির। গত এক দশকে তা অস্বাভাবিক গতি অর্জন করেছে। তবে দেশে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এই অগ্রযাত্রাকে খানিকটা ব্যাহত করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় দুর্নীতিও একটা বাধা। এসব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আরও ত্বরান্বিত হবে, অগ্রগতি টেকসই হবে এবং অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এখন পুরো বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত। এর নাম দেওয়া যেতে পারে : অদম্য বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশকে। বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন সোনার বাংলার স্বপ্ন, চেয়েছিলেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, গড়তে চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ। বর্তমান সরকার সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উন্নতির এই ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অর্জন করতে পারে উন্নত দেশের মর্যাদা।

৬. খ. **ভূমিকা :** প্রকৃতির রূপ বড়োই বিচিত্র। প্রকৃতি মানুষের জন্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার এ প্রকৃতিই মানুষের জীবনে দুর্যোগ বয়ে আনে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, খরা, মহামারি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদ বিনষ্ট হয়। মানুষ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তবে আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। নানা কারণে বাংলাদেশে বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী : দুর্যোগ বলতে আমরা বুঝি, যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে বোঝায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক উপাদানের চরম অস্বাভাবিক অবস্থা, যাতে মানবসমাজ বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাই প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ বা অবস্থা। বাংলাদেশে হয় এমন প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো−

ঝড় : পৃথিবীর অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও তীব্র বাতাস ও বজ্র বিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টিপাত ঝড়ের সাধারণ চিত্র। এসময় সমুদ্র থাকে উত্তাল।

ঘূর্ণিঝড় : ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের তীব্রতা হয় অনেক বেশি। কখনো কখনো ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যায়। সমুদ্রে সৃষ্টি হয় জলোচ্ছ্বাসের। প্রতিবছরই এপ্রিল থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বরে বাংলাদেশে ছোটো বড়ো ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। প্রবল শক্তিসম্পন্ন এ ঝড়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালির উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমুদ্রতীরবর্তী দ্বীপসমূহ। ১৯৭০ সালে মেঘনা মোহনায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, গবাদিপশু ও ফসলেরও ক্ষতি হয় প্রচুর। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, প্রায় ছয় শত কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে শক্তিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। এর ফলে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশ্বের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টর্নেডো : বাংলাদেশে টর্নেডো আঘাত হানে সাধারণত এপ্রিল মাসে, যখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ থাকে। এটি স্বল্পকালীন দুর্যোগ, আঘাতও হানে স্বল্প এলাকা জুড়ে। কিন্তু যেখানে আঘাত হানে সেখানে মাত্র দশ-বিশ মিনিটের মধ্যেই ঐ এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

কালবৈশাখী ঝড় : কালবৈশাখী সাধারণত এপ্রিল-মে মৌসুমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এর গতিবেগ সাধারণত ৪০−৬০ কিলোমিটার হয়ে থাকে। ব্যাপ্তিকালও স্বল্প, কখনো কখনো এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। কালবৈশাখী সাধারণত আঘাত হানে শেষ বিকেলের দিকে। মাঝে মাঝে এ ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়।

বন্যা : বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয়। বন্যায় এদেশের এক বিস্তৃর্ণ ভূ-ভাগ প্লাবিত হয়। ঋতুগত কারণে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নদ-নদীর পানি বেড়ে যায় এবং নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও পাহাড়ি ঢল, জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের কারণে বাংলাদেশে বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় প্রাণহানি কম হলেও সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অনেক গবাদিপশু মারা যায়। বন্যাপরবর্তী সময়ে খাদ্যাভাব এবং নানারকম রোগব্যাধি দেখা দেয়। গৃহহীন হয়ে পড়ে অনেক লোক। বাংলাদেশে ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে সৃষ্ট বন্যায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে বন্যার পরপরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তাতে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। ২০১৮, ২০১৯ সালেও এদেশের কোথাও কোথাও ব্যাপক বন্যা হয়।

নদীভাঙন : বাংলাদেশে প্রতিবছর নদীভাঙনের ফলে বসতভিটা ও ফসলি জমি নদীর বুকে বিলীন হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক সহায় সম্বলহীন হয়ে গ্রাম থেকে শহরে আশ্রয় নেয়।

ভূমিধস : ভূমিধস পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি পাহাড়ি এলাকায় বর্ষা মৌসুমে মাঝে মাঝে পাহাড় ধসে পড়ে। পাহাড়ের কোলঘেঁষে গড়ে ওঠা অনেক ঘরবাড়ি চাপা পড়ে, ঘটে প্রাণহানি। নির্বিচারে ও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পাহাড় কাটার কারণেও ভূমিধস হয়। ভূমিধসের কারণে পাহাড়ি এলাকায় সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ভূমিকম্প : ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ ও মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও আসাম এলাকায় ১৮৯৭ সালে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় দেড় হাজার মানুষ মারা যায়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এ ধরনের ভূকম্প একই এলাকায় একশ থেকে একশ ত্রিশ বছর পর আবার আঘাত হানতে পারে। এছাড়া প্রতি বছর ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকায় এক বা একাধিক মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

আর্সেনিক দূষণ : ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলার অধিবাসীরা মারাত্মক আর্সেনিক দূষণের শিকার।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকার : প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবেই প্রাকৃতিক। এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে নিম্নোক্তভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায় :

১. এদেশের বন্যা সমস্যা মোকাবিলার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বনায়ন করা এবং নদীর পানি বহন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নদী খনন করা যেতে পারে।

২. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে লোকজনকে দ্রুত সরিয়ে নিতে হবে নিরাপদ স্থানে। প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

৩. ভূমিকম্প হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। ধ্বংসযজ্ঞ হলে দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষ অসহায়। তবু অদৃষ্টবাদী হয়ে বসে না থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা যেমন থাকা জরুরি তেমনি ব্যাপক জনসচেতনতারও প্রয়োজন।

৬. গ. **ভূমিকা :** গ্রামবাংলার উৎসব মানুষের প্রাণের স্পন্দন। বহুকাল আগে থেকেই আমাদের সমাজে নানা উপলক্ষ্যে উৎসব পালিত হয়ে আসছে। উৎসব আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যম। বাঙালির জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবের প্রভাব অনস্বীকার্য। এটি মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে। মানসিক বিকাশে ও আনন্দদানে সামাজিক উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির চেতনায় মিশে আছে।

উৎসব : সহজ কথায় 'উৎসব' কথাটির অর্থ হলো আনন্দ বা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। এটি হলো মানুষের আনন্দ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। মূলত উৎসব বলতে এমন অনুষ্ঠানকে বোঝায়, যা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

উৎসবের ধরন : উৎসবকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন– ব্যক্তিগত উৎসব, পারিবারিক উৎসব, সামাজিক উৎসব, ধর্মীয় উৎসব, রাজনৈতিক উৎসব, সাংস্কৃতিক উৎসব, জাতীয় উৎসব, স্মরণোৎসব প্রভৃতি। বিভিন্ন দিবস বা উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষ এসব উৎসব পালন করে থাকে।

সামাজিক উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক উৎসব হলো পহেলা বৈশাখ। এরূপ সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের ধারক। ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক উৎসবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেয়। বাংলা বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ উৎসবে মেতে ওঠে। পহেলা বৈশাখের সাথে মেলার সম্পর্ক সুনিবিড়। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলায় আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প প্রদর্শনী, নাচ, গান, লাঠি খেলা, পুতুলনাচ, সার্কাস প্রভৃতি দর্শকদের আনন্দ দেয়। পহেলা বৈশাখকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা বর্ণাঢ্য বৈশাখী মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। পহেলা বৈশাখের সাথে আরও দুটি অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত। একটি হলো পুণ্যাহ এবং আরেকটি হলো হালখাতা। পুণ্যাহ প্রাচীন জমিদারদের খাজনা আদায়ের অনুষ্ঠান। তাই জমিদারি প্রথা না থাকায় এখন এ অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর হালখাতা অনুষ্ঠান এখনো প্রচলিত আছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। পহেলা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা পুরাতন বছরের হিসেবের খাতা বাদ দিয়ে নতুন বছরের হিসেবের খাতা খোলে। দোকানপাট রঙিন কাগজ দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর করে সাজানো হয়। আর ক্রেতাদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় ও বকেয়া টাকা তোলা হয় এ দিনে। এছাড়াও ইংরেজি মাসের প্রথম দিন ইংরেজি নববর্ষ পালন করা হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। নবান্ন উৎসব, বসন্তবরণ উৎসব, বর্ষবরণ উৎসব, উপজাতিদের বৈসাবিসহ বিভিন্ন উৎসব আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ। বিয়ে একটি প্রাচীন সামাজিক প্রথা। বিয়েকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এছাড়া পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলের সম্মিলনে একটি প্রাণময় উৎসব হলো বিয়ের অনুষ্ঠান, যা অন্যতম একটি সামাজিক উৎসব।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উৎসব : মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু বিষয় বা ঘটনা নিয়েও বিভিন্ন উৎসব পালন করার রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। আবার পারিবারিক বিভিন্ন উৎসব; যেমন– বিবাহ, সুন্নতে খাতনা, সন্তানের অন্নপ্রাশন, হিন্দুদের শ্রাদ্ধ, নবান্ন প্রভৃতি উৎসব পারিবারিক পরিবেশে অত্যন্ত জৌলুস করে পালন করা হয়। অনেক পরিবারে অনেকে জাঁকজমকপূর্ণভাবে জন্মদিন পালন করে থাকে। আবার পরিবারের কারও বিয়ে উপলক্ষ্যে সেই বাড়ি বা এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবার নিজস্ব বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। এদেশের প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলমান। মুসলমানদের প্রধান দুটি উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর মুসলমানরা ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করে। আর ঈদুল আজহায় পশু কোরবানি করা হয়। এছাড়াও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা মহররম, হিজরি নববর্ষ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি (স), শবে বরাত, শবে কদর প্রভৃতি উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। এছাড়াও রয়েছে দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, চৈত্রসংক্রান্তি, হোলি প্রভৃতি উৎসব। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে হিন্দুদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে চলে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব বৌদ্ধ পূর্ণিমা। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো উৎসব যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন বা বড়োদিন। এছাড়া ইস্টার সানডেতেও খ্রিস্টানরা উৎসব পালন করে থাকে।

সাংস্কৃতিক উৎসব : বাঙালির রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে যে সংস্কৃতির চর্চা করে তা বোঝা যায় বাংলাদেশের পালিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব দেখে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বইমেলা, বিজ্ঞান মেলা, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব। এছাড়া আলোচনা সভা, জ্ঞানচর্চামূলক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতিও সংস্কৃতিকে দৃঢ় করে। সংস্কৃতিমনা লোকেরা এসব উৎসব থেকে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করে। তাছাড়া জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, এশীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, লালন উৎসব, পিঠা উৎসব, ঘুড়ি উৎসব প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করে। সাংস্কৃতিক এসব উৎসব গ্রামবাংলার সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

জাতীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় উৎসব হলো **২৬শে মার্চ** স্বাধীনতা দিবস ও **১৬ই ডিসেম্বর** বিজয় দিবস। এ দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এদেশের মানুষ পালন করে। দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ এসব দিবস উদ্‌যাপনে অংশ নেয়। বাঙালি জাতির জীবনে এসব দিবস পরিণত হয়েছে জাতীয় উৎসবে। এসব উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, সেমিনার, মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মেলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন থাকে। **২১শে** ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। দিবসটি বাঙালি জাতির জন্য এক শোকবিধুর দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হয়। এ বইমেলা আমাদের জন্য একটি জাতীয় উৎসব। জাতীয় উৎসবগুলো সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।

উৎসবের অসাম্প্রদায়িক চেতনা : এদেশের সামাজিক উৎসব সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনার স্মারক। সুখী ও সমৃদ্ধ দেশগঠনের পূর্বশর্ত হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমাজ গঠন। আর এসব উৎসব মানুষকে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে বাস করে। ঈদ উৎসবে মুসলমানরা অন্য ধর্মের বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ জানায়। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি বড়ো বড়ো উৎসবে হিন্দুরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমন্ত্রণ জানায়। খ্রিস্টান ও বৌদ্ধরাও তাদের উৎসবে সবাইকে দাওয়াত করে। এভাবে প্রতিটি ধর্মের লোকেরা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আর ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গড়ে ওঠে ভ্রাতৃত্ববোধ।

উপসংহার : বাংলাদেশে বহু সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান হয়। যেকোনো উৎসবই আবহমান বাঙালি-সংস্কৃতি ধারণ করে। উৎসবের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তা। তাই জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

যশোর বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ৩০ মিনিট
পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. 'শরীফ ছবি আঁকে।'– এই বাক্যটি কোন বাচ্য?
ⓚ কর্তাবাচ্য ⓚ কর্মবাচ্য
ⓖ ভাববাচ্য ⓖ কর্মকর্তৃবাচ্য

২. উক্তি পরিবর্তনে অর্থের সঙ্গতি রাখার জন্য কোন পদের পরিবর্তন হয়?
ⓚ বিশেষ্য ⓚ সর্বনাম
ⓖ বিশেষণ ⓖ অব্যয়

৩. একটি শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে যে বোধ জেগে ওঠে, তাকে কী বলে?
ⓚ বাগর্থ ⓚ গৌণার্থ
ⓖ লক্ষ্যার্থ ⓖ বাচ্যার্থ

৪. 'কাছাটিলা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
ⓚ বেহায়া ⓚ কাণ্ডজ্ঞানহীন
ⓖ ভণ্ড ⓖ অসাবধান

৫. 'আগুন' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি?
ⓚ অম্বর ⓚ হুতাশন ⓖ অংশু ⓖ গহন

৬. 'হরণ' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ⓚ আহরণ ⓚ অপহরণ
ⓖ পূরণ ⓖ প্রসারণ

৭. 'উপাধান' শব্দটির অর্থ কী?
ⓚ বালিশ ⓚ উপকরণ
ⓖ আবরণ ⓖ মনোযোগ

৮. কোন নির্দেশকটি শব্দের পরে আলাদাভাবেও বসে?
ⓚ জন ⓚ টা ⓖ টুকু ⓖ খানা

৯. যেসব শব্দের শেষে কারচিহ্ন নেই, সেসব শব্দের সঙ্গে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?
ⓚ য় ⓚ য়ে ⓖ এ ⓖ তে

১০. সাধারণ ক্রিয়ার পুরাঘটিত বর্তমানকালে বক্তা পক্ষের ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?
ⓚ –এছিলাম ⓚ –এছি
ⓖ –লাম ⓖ –ছিলাম

১১. নিচের কোন বাক্যে অন্য পক্ষের সর্বনাম রয়েছে?
ⓚ তারা মাঠে খেলছিল। ⓚ আমরা স্কুলে এসেছি।
ⓖ আমি বিষয়টি পড়েছিলাম। ⓖ তুমি কি পড়াটি শিখেছিলে?

১২. গঠনগত দিক দিয়ে বাক্যকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ⓚ দুই ⓚ তিন ⓖ চার ⓖ পাঁচ

১৩. বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে কী বলে?
ⓚ পূরক ⓚ প্রসারক
ⓖ উদ্দেশ্য ⓖ বিধেয়

১৪. 'ভিক্ষুককে টাকা দাও।'– এটি কোন ধরনের বাক্য?
ⓚ জটিল বাক্য ⓚ যৌগিক বাক্য
ⓖ অক্রিয় বাক্য ⓖ সরল বাক্য

১৫. যে কারকে ক্রিয়ার উৎস নির্দেশ করা হয়, তাকে কোন কারক বলে?
ⓚ কর্ম কারক ⓚ করণ কারক
ⓖ অপাদান কারক ⓖ সম্বন্ধ কারক

১৬. নিচের কোনটি দেশি শব্দ?
ⓚ টোপর ⓚ কুমির
ⓖ বালতি ⓖ চাকু

১৭. ক্রিয়া-বিশেষ্য কোনটি?
ⓚ দয়া ⓚ শয়ন
ⓖ সজ্জিতা ⓖ ধৈর্য

১৮. কোনটি ঘনিষ্ঠ সর্বনাম?
ⓚ আপনি ⓚ তুমি ⓖ তুই ⓖ ইনি

১৯. 'আজকের সভায় অনেক লোক উপস্থিত হয়েছেন'– এ বাক্যে 'অনেক' কোন জাতীয় বিশেষণ?
ⓚ গুণবাচক ⓚ অবস্থাবাচক
ⓖ ভাববাচক ⓖ পরিমাণবাচক

২০. 'প্রধান শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন'– এখানে মুখ্যকর্ম কোনটি?
ⓚ বই ⓚ ছাত্রকে
ⓖ শিক্ষক ⓖ প্রধান

২১. 'যত পড়ছি, ততই নতুন করে জানছি'– বাক্যটিতে কোন ধরনের যোজক ব্যবহৃত হয়েছে?
ⓚ সাধারণ যোজক ⓚ বিকল্প যোজক
ⓖ কারণ যোজক ⓖ সাপেক্ষ যোজক

২২. 'যাকগে, ওসব কথা থাক' বাক্যটিতে রয়েছে–
ⓚ আতঙ্ক আবেগ ⓚ বিরক্তি আবেগ
ⓖ করুণা আবেগ ⓖ অলংকার আবেগ

২৩. ধ্বনি সৃষ্টিকারী বায়ুপ্রবাহের উৎস কোনটি?
ⓚ মুখবিবর ⓚ ফুসফুস
ⓖ শ্বাসনালি ⓖ স্বরযন্ত্র

২৪. মোট কয়টি স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ রয়েছে?
ⓚ ৫টি ⓚ ৭টি ⓖ ১০টি ⓖ ১১টি

২৫. কোনটি পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনি?
ⓚ ল ⓚ র ⓖ শ ⓖ হ

২৬. কোন শব্দটিতে ব-ফলার উচ্চারণ হবে না?
ⓚ বিশ্ব ⓚ নশ্বর
ⓖ আস্বাদন ⓖ স্বাধীন

২৭. সদৃশ অর্থে প্রত্যয়যুক্ত শব্দ কোনটি?
ⓚ বাঘা ⓚ ঢাকাই
ⓖ টেকো ⓖ চোরা

২৮. কোন সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়টিরই সমান প্রাধান্য থাকে?
ⓚ বহুব্রীহি ⓚ কর্মধারয়
ⓖ দ্বন্দ্ব ⓖ তৎপুরুষ

২৯. নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির উদাহরণ কোনটি?
ⓚ একাদশ ⓚ নাবিক
ⓖ বৃহস্পতি ⓖ গবাক্ষ

৩০. ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ হচ্ছে–
ⓚ চুপচাপ ⓚ জ্বলজ্বল
ⓖ মোটাসোটা ⓖ কেক-টেক

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) সুন্দরবন

(খ) বৈশাখী মেলা।

২। (ক) মনে করো, তুমি খুলনার রাইসা। ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তোমার রাজশাহীর বন্ধু মিলিকে একটি পত্র লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি সিলেটের হারুন। তোমার এলাকায় পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর একখানা পত্র লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

মাতৃস্নেহের তুলনা নাই; কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময়ে অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃস্নেহের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আসল শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না– দুর্বল, অসহায় পক্ষিশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বোঝে না– দুর্বলের প্রতি সে স্থিরলক্ষ্য, অসহায় সন্তানের প্রতি মমতার অন্ত নাই– অলসকে সে প্রাণপাত করিয়া সেবা করে– ভীরুতার দুর্দশার কল্পনা করিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে ভীরুকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হয়।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

দৈন্য যদি আসে, আসুক, লজ্জা কিবা তাহে?
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথি মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে,
ঊর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস।

৪। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

অথবা,

(খ) মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।

৫। (ক) মনে করো, তুমি নাবিলা। তুমি 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকার রংপুর অঞ্চলের প্রতিনিধি। বিদ্যালয়ের নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদ প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি নয়ন। 'দৈনিক ভোরের আলো' পত্রিকার দিনাজপুর প্রতিনিধি। 'বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন' সম্পর্কিত একটি সংবাদ প্রতিবেদন রচনা করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) বাংলাদেশের উৎসব

(খ) সময়ানুবর্তিতা

(গ) কৃষিকাজে বিজ্ঞান।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ক	২	খ	৩	ঘ	৪	ঘ	৫	খ	৬	গ	৭	ক	৮	ক	৯	গ	১০	খ	১১	ক	১২	খ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	খ

রচনামূলক

১. ক. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত বিস্তৃত একটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন নামে পরিচিত। নানা ধরনের গাছপালায় পরিপূর্ণ এই সুন্দরবনে বিচিত্র বন্যপ্রাণী বাস করে। সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় চার হাজার বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবন বিস্তৃত। প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার হিসেবে সুন্দরবন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখান থেকে সংগৃহীত হয় নানা ধরনের কাঠ, মধু, মোম ও মৎস্য। প্রায় চারশো নদী ও খাল এবং প্রায় দুইশো দ্বীপ রয়েছে সুন্দরবনে। সুন্দরবনে যেসব গাছ জন্মে এর মধ্যে সুন্দরী, গোলপাতা, কেওড়া, গেওয়া, গরান, বাইন, ধুন্দুল, পশুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বনে বাস করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, বন্য শূকর, বানর, বনবিড়াল, সজারু ইত্যাদি বন্যপ্রাণী। বিচিত্র প্রজাতির পাখির কলকাকলিতে সুন্দরবন মুখর থাকে। ১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

১. খ. নববর্ষকে উৎসবমুখর করে তোলে বৈশাখী মেলা। এটি মূলত সর্বজনীন লোকজ মেলা। এ মেলা অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে হয়ে থাকে। মেলার বিচিত্র আনন্দ-অনুষ্ঠানে, কেনাবেচার বাণিজ্যিক লেনদেনে, মিলনের অমলিন খুশিতে, অবারিত অন্তর প্রীতির স্পর্শে মেলার দিনটি মুখর হয়ে ওঠে। বৈশাখী মেলার প্রথম দিনেই শুরু হয় ব্যবসায়ীদের হালখাতার শুভ মহরত। প্রতিটি বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানেই ক্রেতাদের মিষ্টান্ন সহযোগে আপ্যায়ন করা হয়। সর্বত্রই এক মধুর প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ। বৈশাখী মেলা একদিন থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। এ মেলায় স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য, কারুপণ্য, লোকশিল্পজাত পণ্য, কুটির শিল্পজাত সামগ্রী, সর্বপ্রকার হস্তশিল্পজাত ও মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী, রন্ধনশিল্পজাত সামগ্রী, ফার্নিচারসহ নিত্যব্যবহার্য আধুনিক সবধরনের সামগ্রী পাওয়া যায়। এছাড়া শিশু-কিশোরদের খেলনা, মহিলাদের সাজসজ্জার সামগ্রী এবং বিভিন্ন লোকজ খাদ্যদ্রব্য; যেমন– চিড়া, মুড়ি, খই, বাতাসা ইত্যাদি, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি প্রভৃতির বৈচিত্র্যময় সমারোহ থাকে। মেলায় বিনোদনেরও ব্যবস্থা থাকে। মেলায় অনুষ্ঠিত হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগায়ক ও লোকনর্তকদের উপস্থিতি থাকে। তাঁরা যাত্রা, পালাগান, কবিগান, জারিগান, গম্ভীরা গান, গাজির গানসহ বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত, বাউল-মারফতি-মুর্শিদি-ভাটিয়ালি ইত্যাদি বিভিন্ন আঞ্চলিক গান পরিবেশন করেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নাটক, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, সার্কাস ইত্যাদি মেলার বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া শিশু-কিশোরদের আকর্ষণের জন্য থাকে বায়োস্কোপ। শহরাঞ্চলে নগর সংস্কৃতির আমেজে এখনো বৈশাখী মেলা বসে এবং এ মেলা বাঙালিদের কাছে এক অনাবিল মিলনমেলায় পরিণত হয়। বৈশাখী মেলা বাঙালির আনন্দঘন লোকায়ত সংস্কৃতির ধারক। এ মেলা নিছক একটি আনন্দানুষ্ঠান মাত্র নয়; এটি বাঙালির স্বকীয় ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পরিচায়কও বটে।

২. ক.

২৫শে মে, ২০২...
টুটপাড়া, খুলনা।

প্রিয় মিলি,

শুরুতেই শুভেচ্ছা নিয়ো। অনেক দিন তোমার কোনো চিঠিপত্র পাচ্ছি না। আশা করি সবাইকে নিয়ে ভালো আছ। গত 'মাঘী পূর্ণিমার' ছুটিতে আমি আর তানিয়া বগুড়া জেলায় অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড় দেখতে গিয়েছিলাম। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন পুরাকীর্তি বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য নিদর্শন ও ভাস্কর্য সম্পর্কে শুধু বইতে পড়েছি। এবার স্বচক্ষে দেখে মুগ্ধ হলাম। প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের কথা চিঠিতে লিখে ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব কি না জানি না। তবুও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের আনন্দঘন অভিজ্ঞতা তোমার সাথে ভাগ করে নিতেই কলম ধরলাম।

দিনটি ছিল মঙ্গলবার। সকাল বেলায় আমরা দুজন মহাস্থানগড়ের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে ভগ্নপ্রায় বিরাট দ্বিতল ইমারত। সামনে বিশাল পুকুর। চারপাশে সারি সারি গাছ। পুরাতন সেই ইট-পাথরের প্রতিমূর্তি বাংলার অবলুপ্ত শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাস্তার দুপাশে রয়েছে পুরানো অট্টালিকা। প্রাচীন যুগের কিছু স্থাপত্য নিদর্শন এবং ইতিহাসের উত্থান-পতনের কাহিনি। এসব দেখতে দেখতে যেন অতীতে হারিয়ে গেলাম। সময় পেলে তুমিও একবার দেখতে এসো বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড়। ভালো লাগবে। তোমার লেখাপড়া কেমন চলছে? ভালো থেকো। তোমার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
রাইসা

[**বি. দ্র. :** পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

২. খ. ৫ই জুন, ২০২...
বরাবর
চেয়ারম্যান
জালালাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ, সিলেট।
বিষয় : পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।
জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা সিলেট জেলার অন্তর্গত জালালাবাদ ইউনিয়নের অধিবাসী। আমাদের গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। গ্রামে শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে একটি বড়ো গ্রাম্য বাজার ও নানা ছোটো শিল্প কারখানা, স্কুল, মাদরাসা, একটি ক্লাবঘর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, জ্ঞানপিপাসু ছেলেমেয়েদের জ্ঞানপিপাসা মেটানোর জন্য উক্ত অঞ্চলে বা তার আশেপাশে কোনো পাঠাগার নেই। ফলে জ্ঞানার্জন তথা শিল্পসাহিত্যে সময় ব্যয় করার মতো কোনো মাধ্যম নেই। গ্রামে উঠতি বয়সি যুবক ছেলেরা নানা রকম আড্ডাবাজিতে সময় নষ্ট করে। এতে কেউ কেউ বিপথগামীও হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইতঃপূর্বে এ ব্যাপারে কয়েকবার আবেদন নিবেদন করেও কোনোপ্রকার সাড়া পাওয়া যায়নি।
এমতাবস্থায়, মহোদয়ের কাছে বিনীত অনুরোধ যে, এই গ্রামের বাজারে একটি পাঠাগার স্থাপন করে বাধিত করবেন।
নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
হারুন
জালালাবাদ, সিলেট

৩. ক. মাতৃস্নেহ অতুলনীয় এবং সন্তানের পরিপুষ্টির সহায়ক। তবে অতিরিক্ত স্নেহ কখনো কখনো সন্তানের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে। ফলে সে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হতে দূরে সরে যায়।

৩. খ. ধৈর্য ও সাহস নিয়ে মানুষকে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় পথ অতিক্রম করতে হয়। দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে লড়াই এবং বিপদকে মোকাবিলা না করে জীবনে সাফল্য অর্জিত হয় না।

৪. ক. যার বিবেক ও বুদ্ধি আছে সে-ই মানুষ, পশুদের তা নেই। মানুষ নামের যোগ্য হতে হলে তাকে হতে হবে উদার মনের অধিকারী।
আল্লাহ তায়ালার অপূর্ব সৃষ্টি এ পৃথিবী। অতি যত্নে, মমতায় তিনি সৃষ্টি করেছেন এ বিশ্ব। এ সৃষ্টি বৈচিত্র্যে তার নৈপুণ্যের অন্ত নেই। বিশ্বজগতে যাদের প্রাণ আছে তারাই প্রাণী নামে বিবেচিত। জন্মের দিক দিয়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। জন্মের প্রাথমিক স্তরে অন্যান্য প্রাণীর মতোই তার বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে প্রাকৃতিক নিয়মে। এ বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভের জন্য মানুষকে কোনো চেষ্টা যত্ন, সাধনা বা ত্যাগ স্বীকার করতে হয় না। কিন্তু মানুষের মধ্যকার মন নামক বিশেষ সত্তাটির জন্যই তাকে অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতে হয়। মানুষ ছাড়া অন্য জীবের মধ্যে যা নেই তা হচ্ছে মনের অনুভূতি। এ অনুভূতি উদ্ভূত মানবিক চেতনা। এ মানবিক চেতনা অন্য প্রাণীর না থাকায় মানুষের যে মহৎ গুণাবলি অর্জনের সুযোগ ঘটে তা অন্য প্রাণীর পক্ষে সম্ভব হয় না। মানুষ তার মন দিয়ে সাধনা করে জীবনের বিচিত্র বিকাশ ঘটায়। মনের কার্যকলাপ থেকে সভ্যতা সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞানের ঘটেছে বিকাশ। মানুষের যা কিছু গুণাবলি তার ভিত্তি তার মন। মনের দ্বারাই সে ভালোমন্দ, দোষ, গুণ, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করতে পারে। এ মন থেকেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, যার শারীরিক গঠন মানুষের মতো তিনিই মানুষ। এজন্য তাকে অনেক সাধনা করতে হয়। সুন্দর মনের অভাবে মানুষের প্রাণ থাকলেও সে মানুষে পরিণত হয় না। তার অসুন্দর, অমানবীয় ও পশুর মতো আচরণ তাকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই মানুষের প্রাণে মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করার জন্য অনেক পড়াশোনা এবং সাধনার প্রয়োজন হয়।
আমাদের সমাজে অনেক মানুষও পশুর ন্যায় কাজ করে বেড়াচ্ছে। কারণ তাদের প্রাণে যথার্থ মনুষ্যত্বের উদ্ভব ঘটেনি। এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, মনের মানুষই মানুষ।

৪. খ. এ পৃথিবীতে সুন্দর কর্মের জন্যই মানুষ মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে। অক্ষয় হয়ে থাকে তার মহৎ কর্মগুলো।
এ কথা চিরন্তন সত্য যে, মানুষ মরণশীল। তার দেহ একদিন মাটির সাথে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু এ নশ্বর পৃথিবীতে সে আপন কীর্তির মহিমায় অমরত্ব লাভ করতে পারে। মানুষ শুধু আহার-নিদ্রায়, ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। তার জন্মের মূলে নিশ্চয় স্রষ্টার একটা মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। নইলে মানুষকে বুদ্ধি না দিয়ে পশুর মতো করেই পৃথিবীতে পাঠানো হতো। মানুষের বুদ্ধিমত্তা আছে বলেই সে শুধু আত্মকল্যাণে জীবন কাটিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হতে পারে না, জনকল্যাণের মাঝে নিয়োজিত রেখেই সে তার মানুষ নামের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। ফলে এই জনকল্যাণের মাপকাঠি দিয়েই মানুষের জীবনের মূল্য পরিমাপ করা হয়ে থাকে। যে স্বার্থপর লোক শুধু নিজের সুখের জন্য কাজ করে এবং তার চারপাশের যেসব অসহায় নর নারী রয়েছে; তাদের দুঃখ মোচনের জন্য কোনো কিছুই করে না। মৃত্যুর সাথে সাথেই তার স্মৃতি চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যায়। তার জন্য কেউ শোক জ্ঞাপন করে না এবং তার কথা কেউ কোনো দিন মনে রাখে না। পক্ষান্তরে অন্যের জন্য যারা অকাতরে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, মৃত্যুর পরও তার কীর্তির কথা, তার মহত্ত্বের কথা কেউ ভোলে না। সে সকলের নিকট স্মরণীয়, বরণীয় হয়ে থাকে। মানুষ তার কর্মকে প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধা করে ।
মানুষ পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত বয়সকালের মধ্যে নয়; বরং তার সুকর্মের স্মৃতিতে যুগ যুগ বেঁচে থাকে।

৫. ক. **রংপুর জিলা স্কুলে নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা**

গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২... তারিখে রংপুর জিলা স্কুলে নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল আহাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীরা। তারপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ওই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সরোজ মোস্তফা। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়। বক্তব্য প্রদান করে বিজ্ঞান বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থী অপু ও মিতু, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত ও আবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবীন শিক্ষার্থী হাসান ও রফিক। এসময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেকে তাদের দীর্ঘদিনের ছাত্রজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে চোখ অশ্রুসজল করে ফেলে। অনেকে আবার স্কুলজীবনের মজার স্মৃতিগুলো সবার সামনে তুলে ধরে। শিক্ষকরা খুব মন দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের নির্ভীকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের ভালো ফল প্রত্যাশা করেন। এরপর অতিথিরা স্মারক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। স্কুলের মাঠে নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবাগত শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের একটি উষ্ণ ভাববিনিময় হয়। ভবিষ্যতে এই স্মৃতিগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : নাবিলা, মানবিক বিভাগ, দশম শ্রেণি
প্রতিবেদনের শিরোনাম : রংপুর জিলা স্কুলে নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা
প্রতিবেদনের ধরন : বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদন রচনার তারিখ ও সময় : ২৫শে জানুয়ারি, ২০২...; রাত ৯টা।

৫. খ. **দিনাজপুরে 'বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ' পালন**

নয়ন, দিনাজপুর প্রতিনিধি, ১৪ই জুলাই, ২০২... : ১০ই জুন থেকে দিনাজপুর জিলা স্কুল মাঠে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় ৬৫টি স্টল মেলায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এ মেলা। মেলায় ছিল মানুষের উপচে-পড়া ভিড়। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণিসহ সব বয়স এবং সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। মেলায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিক্রি হয়।

মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন বিকালবেলা আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্দীপনামূলক ও গণসংগীতের ব্যবস্থাও ছিল মেলায়। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক জনাব আলি ইদ্রীস সুজন। আলোচনায় অংশ নেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. ইফতেখারুল আমীন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জামিল হোসেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার মামুন সরোয়ার। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুর জেলাপ্রশাসক ইয়াসিন মোল্লা।

বক্তাগণ বলেন যে, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু রয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ৩০ শতাংশ বনভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে সে মোতাবেক অগ্রসর হতে হবে। বক্তাগণ প্রত্যেককে অন্তত তিনটি করে চারাগাছ লাগানোর জন্য আহ্বান জানান। তাহলে আমাদের দেশে অতিরিক্ত প্রায় ৬০ কোটি গাছ লাগানো সম্ভব হবে; যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। মেলায় সমাপনী দিনে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে সবুজায়ন নার্সারি।

৬. ক. **ভূমিকা :** গ্রামবাংলার উৎসব মানুষের প্রাণের স্পন্দন। বহুকাল আগে থেকেই আমাদের সমাজে নানা উপলক্ষ্যে উৎসব পালিত হয়ে আসছে। উৎসব আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যম। বাঙালির জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবের প্রভাব অনস্বীকার্য। এটি মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে। মানসিক বিকাশে ও আনন্দদানে সামাজিক উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির চেতনায় মিশে আছে।

উৎসব : সহজ কথায় 'উৎসব' কথাটির অর্থ হলো আনন্দ বা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। এটি হলো মানুষের আনন্দ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। মূলত উৎসব বলতে এমন অনুষ্ঠানকে বোঝায়, যা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

উৎসবের ধরন : উৎসবকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন– ব্যক্তিগত উৎসব, পারিবারিক উৎসব, সামাজিক উৎসব, ধর্মীয় উৎসব, রাজনৈতিক উৎসব, সাংস্কৃতিক উৎসব, জাতীয় উৎসব, স্মরণোৎসব প্রভৃতি। বিভিন্ন দিবস বা উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষ এসব উৎসব পালন করে থাকে।

সামাজিক উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক উৎসব হলো পহেলা বৈশাখ। এরূপ সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের ধারক। ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক উৎসবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেয়। বাংলা বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শেণির মানুষ উৎসবে মেতে ওঠে। পহেলা বৈশাখের সাথে মেলার সম্পর্ক সুনিবিড়। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলায় আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প প্রদর্শনী, নাচ, গান, লাঠি খেলা, পুতুলনাচ, সার্কাস প্রভৃতি দর্শকদের আনন্দ দেয়। পহেলা বৈশাখকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা বর্ণাঢ্য বৈশাখী মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন

করে। পহেলা বৈশাখের সাথে আরও দুটি অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত। একটি হলো পুণ্যাহ এবং আরেকটি হলো হালখাতা। পুণ্যাহ প্রাচীন জমিদারদের খাজনা আদায়ের অনুষ্ঠান। তাই জমিদারি প্রথা না থাকায় এখন এ অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর হালখাতা অনুষ্ঠান এখনো প্রচলিত আছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। পহেলা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা পুরাতন বছরের হিসেবের খাতা বাদ দিয়ে নতুন বছরের হিসেবের খাতা খোলে। দোকানপাট রঙিন কাগজ দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর করে সাজানো হয়। আর ক্রেতাদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় ও বকেয়া টাকা তোলা হয় এ দিনে। এছাড়াও ইংরেজি মাসের প্রথম দিন ইংরেজি নববর্ষ পালন করা হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। নবান্ন উৎসব, বসন্তবরণ উৎসব, বর্ষবরণ উৎসব, উপজাতিদের বৈসাবিসহ বিভিন্ন উৎসব আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ। বিয়ে একটি প্রাচীন সামাজিক প্রথা। বিয়েকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এছাড়া পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলের সম্মিলনে একটি প্রাণময় উৎসব হলো বিয়ের অনুষ্ঠান, যা অন্যতম একটি সামাজিক উৎসব।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উৎসব : মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু বিষয় বা ঘটনা নিয়েও বিভিন্ন উৎসব পালন করার রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। আবার পারিবারিক বিভিন্ন উৎসব; যেমন– বিবাহ, সুন্নতে খাতনা, সন্তানের অন্নপ্রাশন, হিন্দুদের শ্রাদ্ধ, নবান্ন প্রভৃতি উৎসব পারিবারিক পরিবেশে অত্যন্ত জৌলুস করে পালন করা হয়। অনেক পরিবারে অনেকে জাঁকজমকপূর্ণভাবে জন্মদিন পালন করে থাকে। আবার পরিবারের কারও বিয়ে উপলক্ষ্যে সেই বাড়ি বা এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবার নিজস্ব বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। এদেশের প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলমান। মুসলমানদের প্রধান দুটি উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর মুসলমানরা ঈদুল ফিতর উদ্যাপন করে। আর ঈদুল আজহায় পশু কোরবানি করা হয়। এছাড়াও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা মহররম, হিজরি নববর্ষ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি (স), শবে বরাত, শবে কদর প্রভৃতি উৎসব সাড়ম্বরে উদ্যাপন করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। এছাড়াও রয়েছে দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, চৈত্রসংক্রান্তি, হোলি প্রভৃতি উৎসব। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে হিন্দুদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে চলে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব বৌদ্ধ পূর্ণিমা। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো উৎসব যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন বা বড়োদিন। এছাড়া ইস্টার সানডেতেও খ্রিষ্টানরা উৎসব পালন করে থাকে।

সাংস্কৃতিক উৎসব : বাঙালির রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে যে সংস্কৃতির চর্চা করে তা বোঝা যায় বাংলাদেশের পালিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব দেখে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বইমেলা, বিজ্ঞান মেলা, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব। এছাড়া আলোচনা সভা, জ্ঞানচর্চামূলক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতিও সংস্কৃতিকে দৃঢ় করে। সংস্কৃতিমনা লোকেরা এসব উৎসব থেকে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করে। তাছাড়া জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, এশীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, লালন উৎসব, পিঠা উৎসব, ঘুড়ি উৎসব প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করে। সাংস্কৃতিক এসব উৎসব গ্রামবাংলার সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

জাতীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় উৎসব হলো ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এ দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এদেশের মানুষ পালন করে। দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ এসব দিবস উদ্যাপনে অংশ নেয়। বাঙালি জাতির জীবনে এসব দিবস পরিণত হয়েছে জাতীয় উৎসবে। এসব উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, সেমিনার, মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মেলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন থাকে। ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। দিবসটি বাঙালি জাতির জন্য এক শোকবিধুর দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হয়। এ বইমেলা আমাদের জন্য একটি জাতীয় উৎসব। জাতীয় উৎসবগুলো সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।

উৎসবের অসাম্প্রদায়িক চেতনা : এদেশের সামাজিক উৎসব সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনার স্মারক। সুখী ও সমৃদ্ধ দেশগঠনের পূর্বশর্ত হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমাজ গঠন। আর এসব উৎসব মানুষকে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে বাস করে। ঈদ উৎসবে মুসলমানরা অন্য ধর্মের বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ জানায়। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি বড়ো বড়ো উৎসবে হিন্দুরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমন্ত্রণ জানায়। খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধরাও তাদের উৎসবে সবাইকে দাওয়াত করে। এভাবে প্রতিটি ধর্মের লোকেরা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আর ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গড়ে ওঠে ভ্রাতৃত্ববোধ।

উপসংহার : বাংলাদেশে বহু সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান হয়। যেকোনো উৎসবই আবহমান বাঙালি-সংস্কৃতি ধারণ করে। উৎসবের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তা। তাই জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. খ. ভূমিকা : জীবনে শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নিয়মের অনুবর্তী হয়ে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাই শৃঙ্খলা। আর শৃঙ্খলাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ এবং তা চর্চার মধ্য দিয়েই জন্ম হয় শৃঙ্খলাবোধের। এটি জীবনের সবকিছুকেই সার্থক করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবোধ শান্তিময় স্বাভাবিক জীবন বয়ে আনতে সহায়তা করে।

শৃঙ্খলা কী : সাধারণত নিয়ম-কানুনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং তার অনুসরণ করাই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলাবোধ শুধু রাষ্ট্রীয় কিছু বিধিনিষেধকে গ্রহণ বা বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অলিখিত কিছু রীতি আছে, যা মানুষকে মেনে চলতে হয়। জগতের সকল কাজের সাথেই শৃঙ্খলা জড়িত, এমনকি বিশ্বজগতের বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যেও শৃঙ্খলার বিষয়টি স্পষ্ট। ঘরে, বাইরে, রাষ্ট্রে যেখানেই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হয়েছে সেখানেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতির রাজত্বে শৃঙ্খলা : শৃঙ্খলাবোধ মানবজীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বিশ্বপ্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিদ্যমান। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা সবকিছুই চলছে নিয়মের মধ্য দিয়ে। এভাবে নিয়মকে অনুসরণ করছে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র। পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামে, ঝরনা মিলিত হয় নদীতে আর নদী ছোটে সমুদ্রের পানে। নদীর জলে জোয়ার আসে, আসে ভাটাও। বর্ষা আসে, শীত আসে, আসে বসন্ত। পৃথিবী আঁধার করা অমাবস্যা কালো পর্দা টেনে দেয় জগৎ সংসারে। পৃথিবীর সবকিছুকে যেন আড়াল করে দেয়। আবার পূর্ণিমা আসে। কোমল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গোটা জগৎ। এ সবই নিয়মশৃঙ্খলাকে মান্য করেই ঘটছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই ছন্দপতন ঘটবে পৃথিবীর। মানুষও স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে ফেলবে। শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যে প্রাণিজগতেও আছে শৃঙ্খলা। তাদের আহার, বিহার, বাসস্থান সবকিছুতে যদি শৃঙ্খলা না থাকত তাহলে বনের প্রাণীরা নেমে আসত হাট-বাজারে, পাখিরা গান গাইত অন্য কোনো স্থানে।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ : ছাত্রজীবনে মানুষ যা কিছু শেখে, যা কিছু অর্জন করে এর প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায়। শৃঙ্খলাবোধ মানুষকে সুনিয়মে চালিত করে বলে ছাত্রজীবনে এর চর্চা থাকলে কোনো ছাত্রের জীবনেই অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে না। কিন্তু যে ছাত্র নিয়ম পালন করে না তার পক্ষে যথাসময়ে যথা কাজ করা অসম্ভব। ফলে পিছিয়ে যেতে যেতে ছাত্রের মনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণার জন্ম হয়। সে উদ্যম হারিয়ে নিজের জীবনকে অর্থহীন করে তোলে, এমনকি বিপথগামী হওয়াও তার পক্ষে সহজ। শৃঙ্খলা নেই এমন ছাত্র ছাত্রমহলে এবং শিক্ষকমহলে সমাদৃত হয় না। অন্যদিকে শৃঙ্খলাবোধে উজ্জীবিত ছাত্র শিক্ষকের স্নেহ আনুকূল্য লাভ করে জীবনকে উন্নত করার সুযোগ পায়। তাই ছাত্রজীবনেই শৃঙ্খলাবোধে জাগ্রত হওয়া অত্যাবশ্যক।

সমাজ ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা : মানুষের সামাজিক সংঘবন্ধ জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন। একটি সমাজে শৃঙ্খলা না থাকলে এর সুন্দর কাঠামোটি ভেঙে যায়। সমাজজীবনে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে একটি উচ্ছৃঙ্খল গোত্রের আবির্ভাব হতে পারে। এর ফলে সমাজে অত্যাচার, লুণ্ঠন এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, সেখানে যে কেউ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের মানুষের ওপর ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ঘটে। আর এ কারণেই সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই সমাজজীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এভাবে জাতীয় জীবনেও রয়েছে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মধ্যে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর অকার্যকর রাষ্ট্র মানেই অরাজকতা এবং সীমাহীন দুর্নীতি। শৃঙ্খলাপূর্ণ জাতি খুব দ্রুত উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। শৃঙ্খলাকে সভ্য সমাজের একটি লক্ষণ বলা যেতে পারে। তাই জাতির জাতীয় অগ্রগতির প্রয়োজনে এবং সভ্য সমাজের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের সকলেরই নিয়ম শৃঙ্খলাকে জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : মানবজীবনকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে চাই অনুকূল পরিবেশ। আর শৃঙ্খলা জীবনে বয়ে আনে সে অনুকূল পরিবেশ। শৃঙ্খলাবোধ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় সুন্দর আগামীর দিকে। শৃঙ্খলার গুরুত্বটি অনুধাবন সহজ হয় সৈনিক জীবনের দিকে তাকালেই। বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করতে গিয়ে কঠোরভাবে মেনে চলে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে যুদ্ধের মাঠে পরাজয় অবধারিত হয়ে যায়। তাই সৈনিকজীবনের উদয়াস্ত সমস্তই শৃঙ্খলাপূর্ণ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো প্রভূত উন্নতি করছে শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করে। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম : শৃঙ্খলাবোধ সবারই কাম্য। আর শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম অশান্তি। যে সমাজ শৃঙ্খলাবর্জিত সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।। শৃঙ্খলা নেই এমন সমাজে যে কেউ আইনকে তার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। ফলে দুর্বল মার খায় সবলের হাতে। সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের জন্য অশান্তি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই শৃঙ্খলার চর্চা নেই। যে কারণে যুগ যুগ ধরে উন্নতির চেষ্টা করেও তারা উন্নতির সাক্ষাৎ পাচ্ছে না; বরং দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে চরমপন্থিদের বিদ্রোহ। শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য নেই বলেই আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অনেক দেশের অর্ধেক শাসনভার সরকারের হাতে, অন্য অর্ধেক বিদ্রোহী চরমপন্থিদের হাতে। এ পরিস্থিতি কল্যাণ রাষ্ট্রের সভ্য জাতির লক্ষণ হতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের উচিত নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হলে তার উপযুক্ত তদারকি করা। আর আইন শৃঙ্খলা অমান্যকারীদের আইনের আওতায় আনতে পারলেই জাতি ভয়াল পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে।

উপসংহার : শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণে সুনাগরিকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবনকে সাফল্যে ভরে দিতে শৃঙ্খলা অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সুনাগরিকের ব্যক্তিসাফল্য বৃহৎ অর্থে জাতীয় সাফল্যের নামান্তর। তাই জাতীয় জীবনে অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন সুনাগরিক অত্যাবশ্যক।

৬. গ. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রম পরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানবসভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. নিচের কোনটি উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ক চন্দ্রমুখ খ শশব্যস্ত
গ কাজলকালো ঘ তুষারশুভ্র

২. নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির উদাহরণ?
ক নাবিক খ স্বল্প
গ গবাদি ঘ গবাক্ষ

৩. নিচের কোনটি 'পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব' শব্দের উদাহরণ?
ক কবি কবি খ কুট কুট
গ চুপচাপ ঘ কেক-টেক

৪. 'লাগাতার' কোন ভাষার শব্দ?
ক আরবি খ ফারসি গ হিন্দি ঘ তুর্কি

৫. 'ভোজন' কোন পদ?
ক বিশেষ্য খ বিশেষণ
গ ক্রিয়াবিশেষ্য ঘ ক্রিয়াবিশেষণ

৬. প্রত্যয় যুক্ত হওয়ায় অবজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত হয় নিচের কোন শব্দ?
ক কানাই খ গেঁয়ো গ বেতো ঘ চোরা

৭. অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে বলে–
ক প্রযোজক ক্রিয়া খ নামক্রিয়া
গ সংযোগ ক্রিয়া ঘ যৌগিক ক্রিয়া

৮. 'অন্ধ অনুকরণ' এর সঠিক বাগ্‌ধারা নিচের কোনটি?
ক গৌরচন্দ্রিকা খ গড্ডলিকা প্রবাহ
গ কলুর বলদ ঘ তেল মাখানো

৯. 'অপরূপ' শব্দের অর্থ শ্রীহীনতার পরিবর্তে 'অনির্বচনীয় সৌন্দর্য' গ্রহণ করলে শব্দের অর্থের কী ঘটে?
ক সংকোচন খ উন্নতি গ অবনতি ঘ বদল

১০. 'মণিকাঞ্চন যোগ'-এর সঠিক সমার্থক বাগ্‌ধারা নিচের কোনটি?
ক সোনায় সোহাগা খ ইতর বিশেষ
গ চিনে জোঁক ঘ উনিশ-বিশ

১১. বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে প্রসারিত করা হয় যেসব শব্দ ও বর্গ দিয়ে, সেগুলোকে বলে–
ক পূরণ খ পূরক গ প্রসারক ঘ প্রসারণ

১২. 'বিচ্ছেদ' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক অবিচ্ছেদ খ দ্বন্দ্ব গ সন্ধি ঘ সমাস

১৩. শব্দজোড় 'অপথ্য, অপত্য' এর মধ্যে 'অপত্য' শব্দের অর্থ কী?
ক যা পথ্য নয় খ যা খাওয়ার নয়
গ স্নেহ ঘ সন্তান

১৪. "কানে কানে যে কথা = কানাকানি"– এখানে 'কানাকানি' কোন সমাস?
ক দ্বন্দ্ব সমাস খ কর্মধারয় সমাস
গ তৎপুরুষ সমাস ঘ বহুব্রীহি সমাস

১৫. বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সচল অঙ্গ কোনটি?
ক দাঁত খ ওষ্ঠ গ নাসিকা ঘ জিভ

১৬. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কী?
ক ধ্বনি খ বর্ণ গ শব্দ ঘ বাক্য

১৭. ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম কী?
ক কারবর্ণ খ অনুবর্ণ
গ সংখ্যা বর্ণ ঘ যুক্ত বর্ণ

১৮. 'ষ্ণ' যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণযোগে গঠিত?
ক ষ্ + ঞ খ ঞ্ + ষ
গ ষ্ + ণ ঘ ণ্ + ষ

১৯. বাংলা ভাষায় কয়টি অর্ধস্বরধ্বনি রয়েছে?
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি

২০. 'স্মরণ' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
ক শোঁরোন্ খ শঁরোন্
গ সোঁরন্ ঘ সঁরোন

২১. 'পাথুরে মূর্তি'– এখানে 'পাথুরে' কোন ধরনের বিশেষণ?
ক গুণবাচক খ অবস্থাবাচক
গ উপাদানবাচক ঘ বিধেয় বিশেষণবাচক

২২. নিচের কোনটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ?
ক প্রগতি খ নীলিমা
গ বেতানো ঘ নাতিন

২৩. "তাকে আসতে বললাম, তবু এলো না।"– এখানে 'তবু' কোন ধরনের যোজক?
ক বিকল্প যোজক খ বিরোধ যোজক
গ কারণ যোজক ঘ সাপেক্ষ যোজক

২৪. "দুর! এ কথা কি বলতে আছে?"– এখানে 'দুর' কোন ধরনের আবেগ?
ক বিরক্তি আবেগ খ আতঙ্ক আবেগ
গ অলংকার আবেগ ঘ বিস্ময় আবেগ

২৫. 'চাঁদ' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি?
ক নিশাকর খ অর্ণব
গ আদিত্য ঘ সবিতা

২৬. নিচের কোনটি যৌগিক বাক্য?
ক বিপদ ও দুঃখ একসঙ্গে আসে।
খ যদি তুমি যাও, তবে তার দেখা পাবে।
গ লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়।
ঘ যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।

২৭. "ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না"– এই বাক্যে 'ফুলের' কোন কারক?
ক কর্ম কারক খ করণ কারক
গ অপাদান কারক ঘ সম্বন্ধ কারক

২৮. নিচের কোনটি পূরণবাচক শব্দ?
ক ১০ খ দশ গ দশম ঘ দশই

২৯. ক্রিয়ার প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা অনুযায়ী বাচ্য কয় প্রকার?
ক দুই প্রকার খ তিন প্রকার
গ চার প্রকার ঘ পাঁচ প্রকার

৩০. পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন করতে হয় কী অনুযায়ী?
ক কর্তা অনুযায়ী খ কর্ম অনুযায়ী
গ উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঘ বিধেয় অনুযায়ী

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসজ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) স্বাধীনতা দিবস

(খ) বইমেলা।

২। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

এ কথা নিশ্চিত যে, জনসংখ্যার উর্ধ্বগতি জাতীয় জীবনে উন্নয়নের গতিকে শ্লথ করে। সমাজ ও পরিবারের জীবনেও তা নানা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। অধিক জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ সমাজ তার সদস্যদের সামাজিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। যেমন, শিক্ষালাভের অধিকার একটি সামাজিক অধিকার। কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার অত্যন্ত কঠিন। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যা এখনও শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই বিপুল জনসংখ্যার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে দেশের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়তে বাধ্য। দেশের নতুন প্রজন্মকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা মানে হলো সম্ভাবনাময় বিশাল জনশক্তির অপচয় ঘটানো।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে।
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে?
সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ডশ্রম,
ফল চাহে,– সেও অতি নির্বোধ, অধম।
খেয়া-তরি চলে গেলে বসে এসে তীরে,
কীসে পার হবে, তরী না আসিলে ফিরে?

৩। (ক) মনে করো, তুমি সাজু। ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তোমার ঢাকার বন্ধু আম্বিয়ার কাছে পত্র লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি বকুল। দক্ষিণ সুরমা সরকারি হাইস্কুল সিলেটের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক। তোমার বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণপত্র লেখো।

৪। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে।

অথবা,

(খ) অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

৫। (ক) মনে করো, তুমি শাওন এবং পি. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সম্প্রতি তোমার বিদ্যালয়ে ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশ উপযোগী একটি প্রতিবেদন তৈরি করো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি নির্ঝর। ‘দৈনিক প্রথম আলো’ পত্রিকার স্থানীয় প্রতিবেদক। তোমার এলাকার একটি রাস্তার দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে পত্রিকায় প্রকাশ উপযোগী একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) সময়ানুবর্তিতা

(খ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

(গ) মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ক	২	ঘ	৩	ক	৪	গ	৫	গ	৬	ঘ	৭	ঘ	৮	খ	৯	খ	১০	ক	১১	গ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ঘ
	১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	গ	২০	খ	২১	গ	২২	ক	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ক

রচনামূলক

১. ক. ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। এটা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ সত্ত্বেও স্বৈরাচার পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় এদেশের জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পাক-সরকার জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকহানাদার বাহিনী কামান, গুলি, ট্যাংক নিয়ে ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। এরই প্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর এ দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সব ভবনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়। ভোরবেলা গণজমায়েত হয় বিভিন্ন প্রাঙ্গণে, শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং রেডিয়ো-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এভাবে সমগ্র দেশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে দিবসটি অত্যন্ত গৌরবের ও মর্যাদার।

১. খ. বইমেলা হলো লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মিলনমেলা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন। তাদের সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই ১৯৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকার বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করেন। সেই থেকে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করা হয় একুশে বইমেলা এবং এর নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা। মাসব্যাপী একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় অসংখ্য বই। মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান তোরণটি সাজানো হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। মেলার ভেতরে বটবৃক্ষের বেদিমূলে তৈরি করা হয় নজরুল মঞ্চ। চারদিকে চক্রাকারে থাকে প্রয়াত জ্ঞানীগুণী মনীষীদের ছবি এবং সাজানো থাকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অমর বাণী। মেলায় প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে স্টল এবং স্টলে সাজানো বই। বইমেলায় সাধারণত সৃজনশীল বইয়ের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন রুচির পাঠক তাদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করে বইমেলা থেকে। শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবারই রুচিসম্মত বইয়ের সমাবেশ থাকে মেলায়। এছাড়া বইমেলায় অনেক লেখকের সাথে পাঠকদের সাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমানকালে বইমেলা বা পুস্তক প্রদর্শনীগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য গ্রন্থ প্রকাশনার জগতে এনেছে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। একুশে বইমেলা একদিকে বাঙালির বই কেনা, পাঠাভ্যাস গঠন ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এক মিলনতীর্থ, অপরদিকে এটি বাঙালির সংগ্রামী চেতনা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ।

২. ক. অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেশের উন্নতির অন্তরায়। এতে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ শিক্ষার মতো সামাজিক অধিকার পায় না। ফলে দেশের বিপুল জনশক্তির অপচয় ঘটে।

২. খ. সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়। সময়মতো কাজ না করলে তাতে কোনো লাভও হয় না। যে সময় চলে যায় তা ফিরে আসে না। কাজেই যথাসময়ে সব কাজ সম্পাদন করা উচিত। নইলে পরে অনুশোচনা করতে হয়।

৩. ক.

২৫শে মে, ২০২...
পীরগাছা, রংপুর।

প্রিয় আম্বিয়া,

শুরুতেই শুভেচ্ছা নিয়ো। অনেক দিন তোমার কোনো চিঠিপত্র পাচ্ছি না। আশা করি সবাইকে নিয়ে ভালো আছ। গত 'মাঘী পূর্ণিমার' ছুটিতে আমি আর সুব্রত বগুড়া জেলায় অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড় দেখতে গিয়েছিলাম। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন পুরাকীর্তি বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য নিদর্শন ও ভাস্কর্য সম্পর্কে শুধু বইতে পড়েছি। এবার স্বচক্ষে দেখে মুগ্ধ হলাম। প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের কথা চিঠিতে লিখে ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব কি না জানি না। তবুও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের আনন্দঘন অভিজ্ঞতা তোমার সাথে ভাগ করে নিতেই কলম ধরলাম।

দিনটি ছিল মঙ্গলবার। সকাল সাতটায় নাস্তা খেয়ে আমরা দুজন মহাস্থানগড়ের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। রংপুর থেকে বেশি দূরে নয় বলে পৌঁছাতে সময় লাগল না। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে ভগ্নপ্রায় বিরাট দ্বিতল ইমারত। সামনে বিশাল পুকুর। চারপাশে সারি সারি গাছ। পুরাতন সেই ইট-পাথরের প্রতিমূর্তি বাংলার অবলুপ্ত শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাস্তার দুপাশে রয়েছে পুরানো অট্টালিকা। প্রাচীন যুগের কিছু স্থাপত্য নিদর্শন এবং ইতিহাসের উত্থান-পতনের কাহিনি। এসব দেখতে দেখতে যেন অতীতে হারিয়ে গেলাম। সময় পেলে তুমিও একবার দেখতে এসো বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড়। ভালো লাগবে। তোমার লেখাপড়া কেমন চলছে? ভালো থেকো। তোমার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
সাজু

[**বি. দ্র. :** পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

৩. খ. রবীন্দ্র জয়ন্তী ১৪...

সুধী,

আগামী ২৫শে বৈশাখ, ১৪...; ৮ই মে, ২০২... শনিবার সকাল ১০টায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬...তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দক্ষিণ সুরমা সরকারি হাই স্কুলের সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে স্কুল-মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন সিলেট জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব সাব্বির জামান। 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন সিলেট সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফরিদ মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব সফিউল্লাহ্।

অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে কামনা করি।

বকুল
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
দক্ষিণ সুরমা সরকারি হাই স্কুল ছাত্রসংসদ

অনুষ্ঠানসূচি

১০:০০ : অতিথিদের আসন গ্রহণ
১০:০৫ : 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ
১০:৩০ : প্রধান অতিথির ভাষণ
১০:৪৫ : সভাপতির ভাষণ
১১:০০ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সংগীত-নৃত্য-আবৃত্তি
১১:৩০ : নাটক 'চিরকুমার সভা'
১২:০০ : অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

৪. ক. ব্যক্তির জীবনাচরণের মধ্যে যা নেই, তা পালনের জন্য অন্যকে উপদেশ দেওয়া যায় না। অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে তা পালন করে দেখাতে হয়। এর ফলে যাকে উপদেশ দেওয়া হয়, সে তা পালন করতে আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়।

কাউকে উপদেশ দেওয়া যত সহজ, উপদেশ পালন করা তার চেয়ে অনেক কঠিন। যে উপদেশ দেয়, সে যদি নিজে তা পালন না করে, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে এর গুরুত্ব থাকে না। অন্যদিকে উপদেশ দানকারী যদি সেই উপদেশের পালনীয় দিক নিজ জীবনে পালন করে দেখান, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশ পালনের দৃষ্টান্ত পেয়ে যান, যা তার জীবনাচরণে প্রভাব ফেলে। সাধারণত ধর্মপ্রবর্তক, ধর্মপ্রচারক, জ্ঞানী ব্যক্তি বা জীবনে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তদের তরফ থেকে উপদেশ-বাণী বর্ষিত হয়ে থাকে। এঁদের দেওয়া উপদেশ মানুষ পালন করতে দ্বিধা করে না। তবে উপদেশ হিসেবে বর্ষিত কথাটুকু তাঁরা নিজেদের জীবনেও অনুসরণ করেন কি না– এ বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক থাকতে হয়। সমাজে অনেক মানুষ থাকে, যারা উপদেশ দিতে খুব পটু, কিন্তু ওইসব উপদেশ তারা নিজেরাই পালন করতে অভ্যস্ত নয়। তখন উপদেশগুলো উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে সেইভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একজন লোক নিয়মিত ধূমপান করে, আবার সে যদি অন্যকে ধূমপান করতে নিষেধ করে, তাহলে তা হাস্যকর উপদেশে পরিণত হয়। তাই কোনো একটা ভালো কাজ করতে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার আগে উপদেশদাতাকেই ভালো কাজটি করতে অভ্যস্ত হতে হবে। তাতে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশের পাশাপাশি উপদেশ পালনের নজিরও গ্রহণ করতে পারে।

কাউকে উপদেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে ভালো মানুষ সাজার ভান করা খুব সহজ, কিন্তু উপদেশ পালন করা খুব কঠিন কাজ। তবে সেই উপদেশদাতাই সর্বোত্তম, যিনি নিজে যা পালন করেন, অন্যকেও তা পালন করতে বলেন।

৪. খ. অন্যায় করা আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া সমান অপরাধ। অন্যায়ভাবে শক্তিমান, ঐশ্বর্যবান হওয়া যেমন দোষের তেমনি অন্যায় সহ্য করার মানসিকতাও সমভাবে নিন্দনীয়।

সহজ ও সুন্দর জীবনযাত্রার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই কিছু নৈতিক কর্তব্য রয়েছে। সামাজিক অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত এই অলিখিত কর্তব্যের যথাযথ রূপায়ণ ঘটলে মানুষের মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ন হয় না। কিন্তু এই মর্যাদা রক্ষার ক্ষমতা বা সাহস সকলের সমান হয় না। ফলে কিছু লোভী, পরশ্রীকাতর ও অত্যাচারী মানুষ দুর্বলের ওপর নির্যাতন করার সাহস পায়। অন্যায়কারীরা নিজের হীন ইচ্ছাকে বীরভোগ্য বসুন্ধরা বা Might is right ভেবে তৃপ্ত হয়। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই মনোভাবে বিশ্বাসীরা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর চড়াও হয়– সুখশান্তি ব্যাহত করে, নির্যাতন চালায়, সম্ভ্রম ও শ্লীলতাহানি করে। কেন তারা এমন করতে পারে? বস্তুত কিছু মানুষের নীরবতা, উদাসীনতা, কাপুরুষতা, পৌরুষহীনতা পরোক্ষভাবে মদদ জোগায় অন্যায়কারীদের। যদি সমস্ত ভয় ভেঙে দুর্বলের দল, নিস্পৃহের দল অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে প্রতিবাদ করতো– তবে অন্যায়কারী পিছু হঠতে বাধ্য হতো। সেক্ষেত্রে অন্যায় কখনোই সংঘটিত হতে পারত না।

মূলত অন্যায়কে সহ্য করা, প্রকারান্তরে অন্যায়কে সমর্থন করা। তাই যে অন্যায় করে সে যেমন পাপী যে অন্যায় কার্যকে সহ্য করে সেও তেমনি পাপী ও ঘৃণ্য।

৫. ক. ২০শে অক্টোবর, ২০২...

বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করলে কৃতার্থ হব।

বিনীত
শাওন
সিলেট জিলা স্কুলে, সিলেট

সিলেট জিলা স্কুলে 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সিলেট জিলা স্কুলে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২... দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব জসিম উদ্দিন।

সকাল ৭টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভোর থেকেই বিদ্যালয়ের আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা খালি পায়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করেন। বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের খালি পায়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারির অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয় শোভাযাত্রা। অবশেষে সকাল ৮টায় শহিদ মিনারের পাদদেশে সকলে উপনীত হলে প্রধান শিক্ষক প্রথম পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অমর শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ফুলের তোড়া শহিদ মিনারে অর্পণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

শহিদ দিবস ও মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচি ছিল কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। শহিদ মিনারের বেদিমূলে সবুজ ঘাসের গালিচার উপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিগণের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। পরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়। আবৃত্তিশেষে শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক গানই ছিল এ পর্যায়ের মূল আকর্ষণ।

বিকেলে আয়োজন করা হয়েছিল আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মুহম্মদ সামাদ। বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী মাতৃভাষা দিবসের ওপর আলোচনা করে। আলোচনার শেষে ছিল পুরস্কার বিতরণ পর্ব। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কবিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান অতিথি। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদকের নাম	:	শাওন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	সিলেট জিলা স্কুলে 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন।
প্রতিবেদনের প্রক্রিয়া	:	বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের সময়	:	দুপুর ১২টা
প্রতিবেদনের তারিখ	:	২৩/০২/২০২...

৫. খ.

সড়কের বেহাল দশা : যাত্রীদের দুর্ভোগ

নির্ঝর, চাটখিল প্রতিনিধি (নোয়াখালী), ২২শে জুলাই ২০২...॥ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার জয়াগ বাজার থেকে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার হাসনাবাদ পর্যন্ত শহিদ মুক্তিযোদ্ধা একরামুল হক সড়কটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে সড়কটির কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। সড়কের এ বেহাল দশায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, বারো কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটির পুরোটাই বড়ো বড়ো গর্ত ও খানাখন্দে ভরা। জয়াগ বাজার থেকে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের নগরপাড়া সেতু পর্যন্ত দুই কিলোমিটার অংশে দুই পাশের মাটি সরে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে নোয়াখালীর চাটখিল ও সোনাইমুড়ি, কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম এবং চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার হাজার হাজার বাসিন্দা চলাচল করে। এছাড়া কমপক্ষে ত্রিশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পথে যাতায়াত করে থাকে। এলাকাবাসী জানান, সড়কটির তিন কিলোমিটার সোনাইমুড়ি এবং বাকি নয় কিলোমিটার চাটখিল উপজেলায় পড়েছে। বিগত ২০২... সালের বন্যায় সড়কটির সুরকির স্তর দেবে গিয়ে বালু বের হয়ে আসে এবং সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। এরপর প্রতি বর্ষায় বৃষ্টিপাতে পানি ও কাদায় সড়কটি একাকার হয়ে যায়, যা এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি পিকআপ ভ্যান ভাওরকোট গ্রামের কাছে রাস্তার গর্তে পড়ে যায়। এতে চালকসহ তিন জন যাত্রী আহত হন।

চাটখিল ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ মানুষ মনে করে, সড়কটি নিয়ে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। অথচ এর সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এটি মেরামতের জন্য স্থানীয় লোকজন সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনো প্রতিকার পায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৬. ক. **ভূমিকা :** মানবজীবনে সময়ানুবর্তিতা তথা শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নিয়মের অনুবর্তী হয়ে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাই শৃঙ্খলা। আর শৃঙ্খলাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ এবং তা চর্চার মধ্য দিয়েই জন্ম হয় শৃঙ্খলাবোধের। এটি জীবনের সবকিছুকেই সার্থক করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবোধ শান্তিময় স্বাভাবিক জীবন বয়ে আনতে সহায়তা করে।

শৃঙ্খলা কী : সাধারণত নিয়ম-কানুনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং তার অনুসরণ করাই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলাবোধ শুধু রাষ্ট্রীয় কিছু বিধিনিষেধকে গ্রহণ বা বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অলিখিত কিছু রীতি আছে, যা মানুষকে মেনে চলতে হয়। জগতের সকল কাজের সাথেই শৃঙ্খলা জড়িত, এমনকি বিশ্বজগতের বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যেও শৃঙ্খলার বিষয়টি স্পষ্ট। ঘরে, বাইরে, রাষ্ট্রে যেখানেই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হয়েছে সেখানেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতির রাজত্বে শৃঙ্খলা : শৃঙ্খলাবোধ মানবজীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বিশ্বপ্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিদ্যমান। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা সবকিছুই চলছে নিয়মের মধ্য দিয়ে। এভাবে নিয়মকে অনুসরণ করছে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র। পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামে, ঝরনা মিলিত হয় নদীতে আর নদী ছোটে সমুদ্রের পানে। নদীর জলে জোয়ার আসে, আসে ভাটাও। বর্ষা আসে, শীত আসে, আসে বসন্ত। পৃথিবী আঁধার করা

অমাবস্যা কালো পর্দা টেনে দেয় জগৎ সংসারে। পৃথিবীর সবকিছুকে যেন আড়াল করে দেয়। আবার পূর্ণিমা আসে। কোমল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গোটা জগৎ। এ সবই নিয়মশৃঙ্খলাকে মান্য করেই ঘটছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই ছন্দপতন ঘটবে পৃথিবীর। মানুষও স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে ফেলবে। শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যে প্রাণিজগতেও আছে শৃঙ্খলা। তাদের আহার, বিহার, বাসস্থান সবকিছুতে যদি শৃঙ্খলা না থাকত তাহলে বনের প্রাণীরা নেমে আসত হাট-বাজারে, পাখিরা গান গাইত অন্য কোনো স্থানে।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ : ছাত্রজীবনে মানুষ যা কিছু শেখে, যা কিছু অর্জন করে এর প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায়। শৃঙ্খলাবোধ মানুষকে সুনিয়মে চালিত করে বলে ছাত্রজীবনে এর চর্চা থাকলে কোনো ছাত্রের জীবনেই অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে না। কিন্তু যে ছাত্র নিয়ম পালন করে না তার পক্ষে যথাসময়ে যথা কাজ করা অসম্ভব। ফলে পিছিয়ে যেতে যেতে ছাত্রের মনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণার জন্ম হয়। সে উদ্যম হারিয়ে নিজের জীবনকে অর্থহীন করে তোলে, এমনকি বিপথগামী হওয়াও তার পক্ষে সহজ। শৃঙ্খলা নেই এমন ছাত্র ছাত্রমহলে এবং শিক্ষকমহলে সমাদৃত হয় না। অন্যদিকে শৃঙ্খলাবোধে উজ্জীবিত ছাত্র শিক্ষকের স্নেহ আনুকূল্য লাভ করে জীবনকে উন্নত করার সুযোগ পায়। তাই ছাত্রজীবনেই শৃঙ্খলাবোধে জাগ্রত হওয়া অত্যাবশ্যক।

সমাজ ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা : মানুষের সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন। একটি সমাজে শৃঙ্খলা না থাকলে এর সুন্দর কাঠামোটি ভেঙে যায়। সমাজজীবনে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে একটি উচ্ছৃঙ্খল গোত্রের আবির্ভাব হতে পারে। এর ফলে সমাজে অত্যাচার, লুণ্ঠন এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, সেখানে যে কেউ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের মানুষের ওপর ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ঘটে। আর এ কারণেই সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই সমাজজীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এভাবে জাতীয় জীবনেও রয়েছে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মধ্যে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর অকার্যকর রাষ্ট্র মানেই অরাজকতা এবং সীমাহীন দুর্নীতি। শৃঙ্খলাপূর্ণ জাতি খুব দ্রুত উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। শৃঙ্খলাকে সভ্য সমাজের একটি লক্ষণ বলা যেতে পারে। তাই জাতির জাতীয় অগ্রগতির প্রয়োজনে এবং সভ্য সমাজের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের সকলেরই নিয়ম শৃঙ্খলাকে জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : মানবজীবনকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে চাই অনুকূল পরিবেশ। আর শৃঙ্খলা জীবনে বয়ে আনে সে অনুকূল পরিবেশ। শৃঙ্খলাবোধ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় সুন্দর আগামীর দিকে। শৃঙ্খলার গুরুত্বটি অনুধাবন সহজ হয় সৈনিক জীবনের দিকে তাকালেই। বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করতে গিয়ে কঠোরভাবে মেনে চলে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে যুদ্ধের মাঠে পরাজয় অবধারিত হয়ে যায়। তাই সৈনিকজীবনের উদয়াস্ত সমস্তই শৃঙ্খলাপূর্ণ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো প্রভূত উন্নতি করছে শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করে। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম : শৃঙ্খলাবোধ সবারই কাম্য। আর শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম অশান্তি। যে সমাজ শৃঙ্খলাবর্জিত সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।। শৃঙ্খলা নেই এমন সমাজে যে কেউ আইনকে তার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। ফলে দুর্বল মার খায় সবলের হাতে। সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের জন্য অশান্তি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই শৃঙ্খলার চর্চা নেই। যে কারণে যুগ যুগ ধরে উন্নতির চেষ্টা করেও তারা উন্নতির সাক্ষাৎ পাচ্ছে না; বরং দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে চরমপন্থিদের বিদ্রোহ। শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য নেই বলেই আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অনেক দেশের অর্ধেক শাসনভার সরকারের হাতে, অন্য অর্ধেক বিদ্রোহী চরমপন্থিদের হাতে। এ পরিস্থিতি কল্যাণ রাষ্ট্রের সভ্য জাতির লক্ষণ হতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের উচিত নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হলে তার উপযুক্ত তদারকি করা। আর আইন শৃঙ্খলা অমান্যকারীদের আইনের আওতায় আনতে পারলেই জাতি ভয়াল পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে।

উপসংহার : শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণে সুনাগরিকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবনকে সাফল্যে ভরে দিতে শৃঙ্খলা অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সুনাগরিকের ব্যক্তিসাফল্য বৃহৎ অর্থে জাতীয় সাফল্যের নামান্তর। তাই জাতীয় জীবনে অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন সুনাগরিক অত্যাবশ্যক।

৬. খ. **ভূমিকা :** বাঙালির আবহমান কালের ইতিহাসে এক মাইলফলক স্বাধীনতা যুদ্ধ। এক মহিমান্বিত ইতিহাস রচিত হয়েছে এই **১৯৭১** সালে। রক্ত, অশ্রু, আর অপরিসীম আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে একাত্তরে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। আর বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অভ্যুদয় হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তিযুদ্ধ তাই আমাদের জাতীয় জীবনে এক অহংকার, গৌরবের এক মহান বিজয়গাথা।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা : গণ-আন্দোলনের মুখে জেনারেল আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান **১৯৬৯** সালে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেই ঘোষণা করলেন, শীঘ্রই সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সামরিক বাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণানুযায়ী **১৯৭০** সালের **১৭ই** ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের **১৬৯টি** আসনের মধ্যে **১৬৭টিতে** এবং প্রাদেশিক পরিষদের **৩৯০টি** আসনের মধ্যে **২৯৮টি** আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খান গড়িমসি শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর পরামর্শে **১৯৭১** সালের তেসরা মার্চ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করেন। ইত্যবসরে জুলফিকার আলী ভুট্টো এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলাপ-আলোচনা করে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান। কিন্তু ইয়াহিয়া খান হঠাৎ পহেলা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

অসহযোগ আন্দোলন : ইয়াহিয়া খানের পহেলা মার্চের ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের জনতা হতবাক হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন–

- সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

- অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
- সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার করতে হবে।
- জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এ আহ্বানে সকল অফিস আদালত, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বাধীনতা আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

আলোচনার নামে প্রহসন : ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় এসে ১৬ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠকে বসেন। দীর্ঘ দশ দিন পর্যন্ত আলোচনা চলে। এ আলোচনা ছিল প্রহসন মাত্র। এ বৈঠকের আড়ালে তারা কালক্ষেপণ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনতে থাকে।

তীব্র আন্দোলন শুরু ও গণপ্রতিরোধ : আলোচনার নামে এরূপ প্রহসনের বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন শুরু হলে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এ আন্দোলন চিরতরে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে ২৫শে মার্চ গভীর রাতে জনগণের ওপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘুমন্ত জনগণের ওপর সেনাবাহিনীর অতর্কিত হামলায় ঢাকা শহর ভয়াল মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণা : ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার সাথে সাথেই সর্বত্র সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়।

অস্থায়ী সরকার গঠন : ১০ই এপ্রিল পূর্ব বাংলার নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যরা মুজিবনগরে এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দেয় এবং ১৭ই এপ্রিল বহুসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, গণপরিষদ সদস্য ও মুক্তিকামী জনতার উপস্থিতিতে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের আম্রকাননে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং মেহেরপুরকেই মুজিবনগর নাম দিয়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করা হয়।

মুক্তিবাহিনী গঠন ও চূড়ান্ত বিজয় : অস্থায়ী সরকার গঠনের পর মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় এবং কর্নেল (অব.) আতাউল গনি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সেনাপতি করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এদেশের অগণিত ছাত্র-জনতা, পুলিশ, ইপিআর, আনসার ও সামরিক বেসামরিক লোকদের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। তারা পাকবাহিনীর মুখোমুখি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে পাকবাহিনীর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর নিঃশর্তভাবে মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রাপ্তি : পাকিস্তানি শোষকদের শোষণ-বঞ্চনা ও ভেদ-বৈষম্যের অবসান, অর্থনৈতিক মুক্তি, সর্বোপরি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হলো, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনো এদেশের মানুষ ঘুমায় পথের ধারে, এখনো মানুষ মরে অনাহারে, এখনো জাতীয় পতাকা পোড়ানো হয়, মসজিদের ইমামকে গুম, হত্যা করা হয়, মন্দিরের জমি-জায়গা দখল করা হয়। এখনো মানবাধিকার লজ্ঘিত হয়, গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের কবলে পড়ে দেশবাসী আজ বড়ো অসহায়। আর এসবই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন : প্রথমত বাংলাদেশের তরুণ যুবকদের সুসংগঠিত করার মধ্য দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। এরপর জনগণের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে রূপরেখা তুলে ধরতে হবে। শিক্ষা-কার্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটসহ এর নানাবিধ ঘটনা উপস্থাপিত করা যেতে পারে। সমস্ত গণমাধ্যমে এ চেতনা বাস্তবায়নে জনমত তৈরি করতে হবে। শুধু রাষ্ট্রের দিকে চেয়ে এই মহান আদর্শকে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, বরং সকলকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে অন্তত এই বিষয়ে একই প্ল্যাটফর্মে সমবেত হতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা এমনকি সমাজকাঠামোতে যে দুর্নীতির রাহুগ্রাস বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তার মূলোৎপাটনে এগিয়ে আসতে হবে। লক্ষ শহিদের রক্তের মর্যাদায়, শত-সহস্র মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে।

আমরা লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে। প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠুক এক সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হয় কবির এ কবিতায়—

'স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা।
স্বাধীনতা তুমি
শহিদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।'

উপসংহার : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসে এক সোনালি অধ্যায়। এ অধ্যায় বড়ো উজ্জ্বল, অত্যন্ত বেদনা ও আনন্দের। মুক্তিযুদ্ধ থেকেই বাঙালির সত্তায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চেতনা জন্ম নেয়। তবে স্বাধীনতার এতো দিন পরেও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তাই ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য দলমত জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে নতুন করে শপথ নিতে হবে।

৬. গ. **ভূমিকা :** মাদকাসক্তি আমাদের সমাজের ভয়াবহ একটি সমস্যা। কিছু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষ নিজেকে মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। একটি জাতির উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করে তরুণসমাজ। কিন্তু মাদক তরুণসমাজের সেই অদম্য কর্মপ্রেরণাকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে নিজেকে যেমন ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তেমনি দেশকেও মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাই এর প্রতিকার করা অত্যাবশ্যক।

মাদকের আবির্ভাব বা উৎস : নেশার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মদ, গাঁজা, আফিম, চরস বা তামাকের কথা বহু আগে থেকেই মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে মাদকের ব্যবহার শুরু হয়, যাকে ইংরেজিতে ড্রাগ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের ব্যথার উপশম হিসেবে ড্রাগের ব্যবহার হলেও পরে হতাশা কাটাতেও তারা ড্রাগ ব্যবহার করতো। এরপর থেকেই কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশে নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ড্রাগের ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীব্যাপী।

মাদকদ্রব্যের প্রকারভেদ : সমাজে নানা ধরনের মাদকদ্রব্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– হেরোইন, প্যাথেড্রিন, এলএসডি, মারিজুয়ানা, কোকেন, হাসিস প্রভৃতি আধুনিককালের মাদকদ্রব্য; তবে এর মধ্যে হেরোইন ও কোকেন বেশ দামি। আমাদের দেশের যুবসমাজ সচরাচর যে মাদকদ্রব্যগুলো ব্যবহার করে সেগুলো হলো– সিডাকসিন, ইনকটিন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, ডেক্সপোটেন, গাঁজা ইত্যাদি। তবে এ সবকিছুর ব্যবহারকে ছাড়িয়ে গেছে অত্যাধুনিক এক মাদক যার নাম ইয়াবা।

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার : দেশে মাদকের ব্যবহার বহু বিচিত্র। মানুষ নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ করতে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। মাদকের ব্যবহার করে সে কল্পনার জগতে বিচরণ করে। এক্ষেত্রে মাদক ব্যবহারকারীরা নানা ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে। যেমন– ধূমপান, ইনহেল বা শ্বাসের মাধ্যমে, জিহ্বার নিচে গ্রহণের মাধ্যমে, সরাসরি সেবনের মাধ্যমে, স্কিন পপিং ও মেইন লাইনিংয়ের মাধ্যমে। তবে যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন তাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো নেশায় উন্মত্ত হওয়া। প্রথমে কৌতূহলের বশে অনেকেই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে অভ্যস্ত হয়ে ভয়াবহ এক সর্বনাশের পথে এগিয়ে যায় তারা।

মাদকাসক্তির কারণ : এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ ব্যক্তিজীবনের হতাশা। মানুষ যখন জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়ে, তখন সে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয়। হতাশাগ্রস্ত সাধারণ তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের হারও অনেক বেশি। তাছাড়া অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হয়েও অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। যেসব পরিবারে পারিবারিক অশান্তি অনেক বেশি, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের জীবন বিশৃঙ্খল হতে থাকে। তারা এই বিশৃঙ্খলা থেকে ধীরে ধীরে মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরা প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় এ ধরনের অনেক ঘটনাই লক্ষ করি। বেশির ভাগ মাদকসেবী দেখা যায় যারা বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীর সংস্পর্শে মাদকে আসক্ত হয়, তবে পারিবারিক অশান্তিই মাদকাসক্তির বিশেষ কারণ হিসেবে দেখা যায়।

মাদক চোরাচালান : সাধারণত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদক চোরাচালান হয়। সীমান্তে স্থল বা জলপথে এবং আকাশপথে বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ মাদক চোরাচালান নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে যার পেছনে রয়েছে বিরাট এক সিন্ডিকেট। কিছুকাল আগেও মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের 'স্বর্গভূমি'। তবে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই নেটওয়ার্ক ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পরেই চোরাচালানকারীরা ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে গড়ে তোলে ড্রাগ পাচারের নতুন ভিত্তিভূমি, যার নাম 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'।

বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন : বাংলাদেশে মাদকের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা এই মাদক আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মায়ানমার থেকে অবাধে এদেশে প্রবেশ করছে ইয়াবা, যাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে বহু তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতি। দর্শনার 'কেরু এন্ড কোম্পানি' এদেশের একমাত্র লাইসেন্সধারী মদ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তার বাইরে বহু বিদেশি কোম্পানির মদ অবৈধভাবে অবাধে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গাঁজা ও আফিমের মতো মাদকদ্রব্যও অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতা : মাদকাসক্তিকে অপ্রতিরোধ্য রোগ এইডসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাদকাসক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ইয়াবা ও হেরোইনের মতো মাদকদ্রব্য মানুষের শরীরের সমস্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এর আসক্তিতে মানুষ এক অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে। নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ জীবনে ফিরে আসাও খুব সহজ হয় না। শরীরে মাদক গ্রহণ বন্ধ করা মাত্রই **'উইথড্রয়াল সিমটম'** শুরু হয়। তখন মাদক না পেলে শুরু হয় টার্কি পিরিয়ড; হাত পা কাঁপতে থাকে; অসম্ভব শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তা হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে। তখন সুচিকিৎসা না পেলে খুব অল্প সময়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ : বিশ্বজুড়ে যে মাদকবিষ ছড়িয়ে পড়ছে তার থাবা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সমাজসেবীরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দেশে দেশে নানা সংস্থা ও সংগঠন মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। আমাদের দেশেও মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যম মাদকবিরোধী জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে :

১. মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভেষজ ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ,
২. সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নেশার হাতছানি থেকে তাদের দূরে রাখা,
৩. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মাদকাসক্তির মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা,
৪. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা,
৫. বেকার যুবকদের জন্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

উপসংহার : মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যায় তরুণরাই বেশি আসক্ত। একটি দেশের গতিশীলতাকে অব্যাহত রাখে তরুণসমাজ। তারাই যদি মাদকের কবলে পড়ে নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, তবে দেশের সার্বিক অগ্রগতি চরমভাবে বিনষ্ট হবে। তাই তরুণসমাজকে মাদক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এর কারবারিদের সর্বাগ্রে বয়কট করতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা বাংলাদেশ মাদকমুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হোক।

সিলেট বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. পূরণবাচক বিশেষণ কোনটি?
ক আটদিন খ ৩৪তম অনুষ্ঠান
গ নীল আকাশ ঘ কতক্ষণ সময়

২. অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি কোনটি?
ক ভ খ ধ গ থ ঘ ঙ

৩. নিচের কোন প্রকৃতি-প্রত্যয়ের বিশ্লেষণটি সঠিক?
ক চল্ + ঈষ্ণু = চলিষ্ণু খ পঠ্ + ঈত = পঠিত
গ ভাজ্ + ঈ = ভাজি ঘ মিশর + ঈয় = মিশরীয়

৪. নিচের কোনটিতে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে?
ক চৌরাস্তা খ বিষাদসিন্ধু
গ চাঁদমুখ ঘ নয়ছয়

৫. 'শীতার্ত' সন্ধিটি কোন নিয়মে সাধিত হয়েছে?
ক অ + ঋত = আর্ খ অ + রীত = আর্
গ আ + রিত = আর্ ঘ আ + ঋত = আর্

৬. কোনটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ?
ক চুপচাপ খ দমাদম
গ গরম গরম ঘ টুংটুং

৭. সজিব অংকে ভালো– বাক্যে 'অংক' কোন কারক?
ক অপাদান কারক খ অধিকরণ কারক
গ সম্বন্ধ কারক ঘ করণ কারক

৮. বাক্যে গৌণ কর্মের সাথে কোন বিভক্তির প্রয়োগ হয়?
ক –য়ের খ –তে গ –র ঘ –কে

৯. সাধারণ বাক্যের প্রধান অংশ কয়টি?
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি

১০. অর্থের সংগতি রাখার জন্য বাক্যে ব্যবহৃত কোন পদের পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়?
ক সর্বনাম খ বিশেষ্য
গ অব্যয় ঘ বিশেষণ

১১. 'প্রতিশব্দ' কী?
ক অভিন্ন শব্দ খ ভিন্ন শব্দ
গ ভিন্নার্থক শব্দ ঘ বিপরীত শব্দ

১২. ঠোঁট খোলা বা বন্ধ থাকার ভিত্তিতে স্বরধ্বনি কয় ভাগে বিভক্ত?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

১৩. 'সমীরণ' 'অনিল' 'মরুৎ' ইত্যাদি কোন শব্দের প্রতিশব্দ?
ক বাতাস খ মেঘ
গ রাত ঘ সমুদ্র

১৪. কোনটি সকলবাচক সর্বনাম?
ক যেমন তেমন খ এই গ কারা ঘ সবাই

১৫. 'শয়ন' কোন ধরনের বিশেষ্য?
ক সমষ্টি বিশেষ্য খ বস্তু বিশেষ্য
গ ক্রিয়াবিশেষ্য ঘ গুণ বিশেষ্য

১৬. নিচের কোন বাক্যটি সরল ক্রিয়ার উদাহরণ?
ক বৃষ্টি থেমে গেল। খ মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।
গ আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। ঘ ছেলেরা মাঠে খেলছে।

১৭. নিচের কোনটি বহুপদী ক্রিয়াবিশেষণের উদাহরণ?
ক আস্তে খ চুপি চুপি
গ ভালোভাবে ঘ চেঁচিয়ে

১৮. 'চুল'-এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক কুন্তল খ অক্ষি
গ কল্লোল ঘ অংশু

১৯. 'ধৃষ্ট' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক নির্দোষ খ বিযুক্ত গ নম্র ঘ উগ্র

২০. নিচের কোনটি 'খয়ের খাঁ' বাগ্‌ধারার অর্থ প্রকাশ করছে?
ক খাওয়া দাওয়া খ চাটুকার
গ অন্ধ অনুকরণ ঘ বিত্তের অহংকার

২১. 'বাচ্যার্থ' শব্দের কোন ধরনের অর্থ প্রকাশ করে?
ক গৌণ খ প্রত্যক্ষ
গ পরোক্ষ ঘ মুখ্য

২২. যে বাক্যের ক্রিয়া কর্তাকে অনুসরণ করে, তাকে কী বাচ্য বলে?
ক কর্তাবাচ্য খ কর্মবাচ্য
গ ভাববাচ্য ঘ কর্মকর্তৃবাচ্য

২৩. কোন সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্যকিছু বোঝায়?
ক বহুব্রীহি সমাস খ কর্মধারয় সমাস
গ দ্বন্দ্ব সমাস ঘ তৎপুরুষ সমাস

২৪. 'ঔষধ' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
ক ঔষোধ খ ওউশধ্
গ ওশোধ ঘ ঔসোদধ

২৫. দন্তমূল এবং তালুর মাঝখানে যে উঁচু অংশ থাকে তার নাম কী?
ক কণ্ঠ খ তালু গ ওষ্ঠ ঘ মূর্ধা

২৬. দ্বিস্বরধ্বনি কয়টি?
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি

২৭. 'পরিত্যাগ' শব্দে 'পরি' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক ছোটো খ অসম্পূর্ণ
গ অর্ধেক ঘ সম্পূর্ণ

২৮. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি?
ক একাদশ খ ষষ্ঠ
গ মনোযোগ ঘ কুলটা

২৯. কোনটি ভগ্নাংশ পূরণবাচক শব্দ?
ক অষ্টম খ ১৪ই
গ তেহাই ঘ দ্বাদশী

৩০. কোনটি ফারসি শব্দ?
ক হজ খ কারখানা
গ জাকাত ঘ হালুয়া

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) স্বাধীনতা দিবস

(খ) বইমেলা।

২। (ক) মনে করো, তুমি মাহিন। তুমি কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার অধিবাসী। তোমার এলাকায় পাঠাগার স্থাপনের জন্যে উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখো। ১০

অথবা,

(খ) তোমার উপজেলায় অবস্থিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুর্দশার কথা জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

অভ্যাস ভয়ানক জিনিস– একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন; মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে ধীর ও সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক করো সপ্তাহে অন্তত একদিন তুমি মিথ্যা বলবে না। ছয়মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্যকথা বলতে অভ্যাস করো। তারপর এক শুভদিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করো, সপ্তাহে তুমি দুইদিন মিথ্যা বলবে না। এক বছর পরে দেখবে সত্যকথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে তখন ইচ্ছা করলেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা কোরো না। তাহলে সব পণ্ড হবে।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা,
'কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস–
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

৪। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

অথবা,

(খ) অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

৫। (ক) মনে করো, তুমি মুনিম। 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার। তোমার এলাকায় অনুষ্ঠিত সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা বিষয়ক একটি সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি অর্থি। একটি দৈনিক পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক। রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে 'শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন সম্পর্কিত একটি সংবাদ প্রতিবেদন রচনা করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) সময়ানুবর্তিতা

(খ) কৃষিকাজে বিজ্ঞান

(গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ⓚখ	২	গ	৩	ঘ	৪	খ	৫	ক	৬	ঘ	৭	খ	৮	ঘ	৯	খ	১০	ক	১১	ক	১২	গ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	গ
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	গ	২০	খ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	খ

রচনামূলক

১. ক. ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। এটা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ সত্ত্বেও স্বৈরাচার পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় এদেশের জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পাক-সরকার জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকহানাদার বাহিনী কামান, গুলি, ট্যাংক নিয়ে ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। এরই প্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর এ দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সব ভবনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়। ভোরবেলা গণজমায়েত হয় বিভিন্ন প্রাঙ্গণে, শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং রেডিয়ো-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এভাবে সমগ্র দেশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে দিবসটি অত্যন্ত গৌরবের ও মর্যাদার।

১. খ. বইমেলা হলো লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মিলনমেলা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন। তাদের সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই ১৯৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকার বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করেন। সেই থেকে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করা হয় একুশে বইমেলা এবং এর নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা। মাসব্যাপী একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় অসংখ্য বই। মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান তোরণটি সাজানো হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। মেলার ভেতরে বটবৃক্ষের বেদিমূলে তৈরি করা হয় নজরুল মঞ্চ। চারদিকে চক্রাকারে থাকে প্রয়াত জ্ঞানীগুণী মনীষীদের ছবি এবং সাজানো থাকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অমর বাণী। মেলায় প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে স্টল এবং স্টলে সাজানো বই। বইমেলায় সাধারণত সৃজনশীল বইয়ের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন রুচির পাঠক তাদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করে বইমেলা থেকে। শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবারই রুচিসম্মত বইয়ের সমাবেশ থাকে মেলায়। এছাড়া বইমেলায় অনেক লেখকের সাথে পাঠকদের সাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমানকালে বইমেলা বা পুস্তক প্রদর্শনীগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য গ্রন্থ প্রকাশনার জগতে এনেছে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। একুশে বইমেলা একদিকে বাঙালির বই কেনা, পাঠাভ্যাস গঠন ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এক মিলনতীর্থ, অপরদিকে এটি বাঙালির সংগ্রামী চেতনা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ।

২. ক. ৫ই জুন, ২০২...

বরাবর

চেয়ারম্যান

লাকসাম ইউনিয়ন পরিষদ, কুমিল্লা।

বিষয় : পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত লাকসাম ইউনিয়নের অধিবাসী। আমাদের গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। গ্রামে শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে একটি বড়ো গ্রাম্য বাজার ও নানা ছোটো শিল্প কারখানা, স্কুল, মাদরাসা, একটি ক্লাবঘর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, জ্ঞানপিপাসু ছেলেমেয়েদের জ্ঞানপিপাসা মেটানোর জন্য উক্ত অঞ্চলে বা তার আশেপাশে কোনো পাঠাগার নেই। ফলে জ্ঞানার্জন তথা শিল্পসাহিত্যে সময় ব্যয় করার মতো কোনো মাধ্যম নেই। গ্রামে উঠতি বয়সি যুবক ছেলেরা নানা রকম আড্ডাবাজিতে সময় নষ্ট করে। এতে কেউ কেউ বিপথগামীও হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইতঃপূর্বে এ ব্যাপারে কয়েকবার আবেদন নিবেদন করেও কোনোপ্রকার সাড়া পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, মহোদয়ের কাছে বিনীত অনুরোধ যে, এই গ্রামের বাজারে একটি পাঠাগার স্থাপন করে বাধিত করবেন।

নিবেদক

এলাকাবাসীর পক্ষে

মাহিন

লাকসাম, কুমিল্লা

২. খ. ২০শে অক্টোবর, ২০২...
বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত ‘দৈনিক ইনকিলাব’ পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করলে কৃতার্থ হব।
বিনীত
রেজাউর রহমান
লোহাগড়া, নড়াইল।

আমাদা বাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির প্রতি নজর দিন

নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানাধীন আমাদা বাজারের স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। লোহাগড়াসহ আশেপাশের প্রায় দশ গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিন এ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা লাভ করে আসছে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এখানকার চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। বিল্ডিংগুলো পুরানো ও জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। নিয়মিত ঔষধ সরবরাহ নেই। আউটডোর, ইনডোর মিলিয়ে পাঁচ জন ডাক্তারের পদ শূন্য হয়ে আছে। সামান্য ঔষধপত্র যা আসে তারও ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার কেউ নেই। এভাবে সঠিক চিকিৎসার অভাবে রোগীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ছে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, কোনো রোগীর প্রতি সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসাটি প্রয়োগ না করার ফলে তার মৃত্যুও ঘটেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির দুরবস্থা থেকে উন্নতি না হলে গ্রামের মানুষের পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এ পরিস্থিতিতে এলাকার জনগণের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারা ফিরিয়ে আনতে এবং জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির মান উন্নত করে ও সংস্কার করে সেখানে উন্নত প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও ওষুধ সামগ্রীর সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন মহলে আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, এ ব্যাপারে যেন আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

নিবেদক
গ্রামবাসীর পক্ষে
রেজাউর রহমান

৩. ক. অভ্যাসের দাস না হয়ে ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সাধনায় ব্রতী হওয়া উচিত। এটাই মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ। মিথ্যা বলার প্রবণতা দূর করে সত্য বলার অভ্যাস গঠনের জন্য চাই সাধনা। সাধনার মাধ্যমেই মানুষ পাপ ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফল হতে পারে।

৩. খ. পরিশ্রমের মাঝে যা পাওয়া যায় তার দাম যেমন অনেক, তার গৌরবও বেশি। যেকোনো উন্নতির মূলে রয়েছে শ্রমবৃদ্ধি, শ্রমসাধনা। আর যা করুণার দান, ভিক্ষার দান, তা গ্রহণ করায় রয়েছে লজ্জা। এর ভেতর কোনো গৌরব নেই।

৪. ক. দুর্জন মানে দুষ্ট প্রকৃতির লোক। এ ধরনের মানুষ যত বিদ্বানই হোক না কেন তার সাহচর্যে একটি পবিত্র চরিত্র সহজেই কলুষিত হয়। তাই বিদ্বান দুর্জনের সাহচর্য ত্যাগ করা উচিত।

বিদ্যাশিক্ষা মানবজীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়। বিদ্বান মানুষ তাই সকলের দ্বারা সম্মানিত, সকলের নিকট পূজনীয়। বলা হয়ে থাকে, বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। জ্ঞানীর নিদ্রা মূর্খের ইবাদতের চেয়েও মূল্যবান। কথাটি হাদিসেই এসেছে। তাই জ্ঞানী বা বিদ্বান মানুষের মূল্য সম্পর্কে সংশয় থাকার কোনো অবকাশই নেই। বস্তুত বিদ্বান মানুষ আলোকিত, আলোকপ্রাপ্ত। পতঙ্গ যেমন আলোর কাছে ভিড় করে তেমনি সমাজের মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ। তাদের সঙ্গ ও সাহচর্য সবাইকে পরিতৃপ্ত করে। ধর্মীয় উপদেশ এবং জ্ঞানীদের নীতিকথায় সকলকে বিদ্বানের সান্নিধ্য লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তবে জ্ঞানী মানুষ পেলেই তার কাছে সভক্তিতে ছুটে যেতে হবে এমন নয়। বিদ্বান ব্যক্তি যদি সচ্চরিত্র ও সুন্দর মানবীয় গুণের অধিকারী না হয় তাহলে সে মূর্খের চেয়েও বিপজ্জনক। কারণ মূর্খ মানুষকে কেউ অনুসরণ বা অনুকরণ করে না। তাদের কথাও কেউ মানতে চায় না। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তির কথা মানুষ অন্ধের মতো অনুসরণ করে, তার জীবনাচরণকে অন্যরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই বিদ্বান ব্যক্তি যদি দুর্জন বা অসৎ হয় তাহলে তার দ্বারা সাধারণ মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটার আশঙ্কা খুব বেশি। তাই বিদ্বান ব্যক্তি চরিত্রবান কিনা, তা না দেখে তার প্রতি ঝুঁকে পড়া উচিত হবে না। বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যদি মানবজীবনে গড়ে না ওঠে তাহলে সে বিদ্যার কোনো মূল্য নেই। এ ধরনের মানুষ জ্ঞানপাপী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। আর জ্ঞানপাপীকে এড়িয়ে চলাতেই সকলের মঙ্গল।

দুর্জন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও সে সদা পরিত্যাজ্য। তার সাহচর্যে এলে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। তাই তার সাহচর্য ত্যাগ করা উচিত।

৪. খ. অন্যায় করা আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া সমান অপরাধ। অন্যায়ভাবে শক্তিমান, ঐশ্বর্যবান হওয়া যেমন দোষের তেমনি অন্যায় সহ্য করার মানসিকতাও সমভাবে নিন্দনীয়।

সহজ ও সুন্দর জীবনযাত্রার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই কিছু নৈতিক কর্তব্য রয়েছে। সামাজিক অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত এই অলিখিত কর্তব্যের যথাযথ রূপায়ণ ঘটলে মানুষের মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু এই মর্যাদা রক্ষার ক্ষমতা বা সাহস সকলের সমান হয় না। ফলে কিছু লোভী, পরশ্রীকাতর ও অত্যাচারী মানুষ দুর্বলের ওপর নির্যাতন করার সাহস পায়। অন্যায়কারীরা নিজের হীন ইচ্ছাকে বীরভোগ্য বসুন্ধরা বা Might is right ভেবে তৃপ্ত হয়। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই মনোভাবে বিশ্বাসীরা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর চড়াও হয়– সুখশান্তি ব্যাহত করে, নির্যাতন চালায়, সম্ভ্রম ও শ্লীলতাহানি করে। কেন তারা এমন করতে পারে? বস্তুত কিছু মানুষের নীরবতা, উদাসীনতা, কাপুরুষতা, পৌরুষহীনতা পরোক্ষভাবে মদদ জোগায় অন্যায়কারীদের। যদি সমস্ত ভয় ভেঙে দুর্বলের দল, নিস্পৃহের দল অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে প্রতিবাদ করতো– তবে অন্যায়কারী পিছু হঠতে বাধ্য হতো। সেক্ষেত্রে অন্যায় কখনোই সংঘটিত হতে পারত না।

মূলত অন্যায়কে সহ্য করা, প্রকারান্তরে অন্যায়কে সমর্থন করা। তাই যে অন্যায় করে সে যেমন পাপী যে অন্যায় কার্যকে সহ্য করে সেও তেমনি পাপী ও ঘৃণ্য।

৫. ক.

চারুকলায় সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা

মুনিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, ঢাকা, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২... ॥

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। সকাল নয়টায় অনুষদ প্রাঙ্গণের বকুলতলায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। নির্দিষ্ট রচনা থেকে লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। দুটি বিভাগে ছিল এ আয়োজন– বাংলা ও ইংরেজি। বিকালে ছিল পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতি বিভাগে তিন জন করে মোট ছয় জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন এই চারুকলা অনুষদের শিক্ষক অধ্যাপক মুকুল কুমার মিত্র, ড. আয়শা সুলতানা ও ড. আফজাল হোসেন খান। জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সংস্কৃতিকর্মী জনাব ফজলুল হক। এরপর চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক পর্ব উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শক ও অতিথিবৃন্দ।

৫. খ.

রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২... দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব জসিম উদ্দিন।

সকাল ৭টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভোর থেকেই বিদ্যালয়ের আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা খালি পায়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করেন। বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের খালি পায়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারির অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয় শোভাযাত্রা। অবশেষে সকাল ৮টায় শহিদ মিনারের পাদদেশে সকলে উপনীত হলে প্রধান শিক্ষক প্রথম পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অমর শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ফুলের তোড়া শহিদ মিনারে অর্পণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

শহিদ দিবস ও মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচি ছিল কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। শহিদ মিনারের বেদিমূলে সবুজ ঘাসের গালিচার উপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিগণের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। পরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়। আবৃত্তিশেষে শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক গানই ছিল এ পর্যায়ের মূল আকর্ষণ।

বিকেলে আয়োজন করা হয়েছিল আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মুহম্মদ সামাদ। বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী মাতৃভাষা দিবসের ওপর আলোচনা করে। আলোচনার শেষে ছিল পুরস্কার বিতরণ পর্ব। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কবিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান অতিথি। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদকের নাম	:	অর্থি
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন।
প্রতিবেদনের প্রক্রিয়া	:	বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের সময়	:	দুপুর ১২টা
প্রতিবেদনের তারিখ	:	২৩/০২/২০২...

৬. ক. **ভূমিকা :** মানবজীবনে সময়ানুবর্তিতা তথা শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নিয়মের অনুবর্তী হয়ে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাই শৃঙ্খলা। আর শৃঙ্খলাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ এবং তা চর্চার মধ্য দিয়েই জন্ম হয় শৃঙ্খলাবোধের। এটি জীবনের সবকিছুকেই সার্থক করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবোধ শান্তিময় স্বাভাবিক জীবন বয়ে আনতে সহায়তা করে।

শৃঙ্খলা কী : সাধারণত নিয়ম-কানুনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং তার অনুসরণ করাই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলাবোধ শুধু রাষ্ট্রীয় কিছু বিধিনিষেধকে গ্রহণ বা বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অলিখিত কিছু রীতি আছে, যা মানুষকে মেনে চলতে হয়। জগতের সকল কাজের সাথেই শৃঙ্খলা জড়িত, এমনকি বিশ্বজগতের বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যেও শৃঙ্খলার বিষয়টি স্পষ্ট। ঘরে, বাইরে, রাষ্ট্রে যেখানেই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হয়েছে সেখানেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতির রাজত্বে শৃঙ্খলা : শৃঙ্খলাবোধ মানবজীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বিশ্বপ্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিদ্যমান। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা সবকিছুই চলছে নিয়মের মধ্য দিয়ে। এভাবে নিয়মকে অনুসরণ করছে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র। পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামে, ঝরনা মিলিত হয় নদীতে আর নদী ছোটে সমুদ্রের পানে। নদীর জলে জোয়ার আসে, আসে ভাটাও। বর্ষা আসে, শীত আসে, আসে বসন্ত। পৃথিবী আঁধার করা অমাবস্যা কালো পর্দা টেনে দেয় জগৎ সংসারে। পৃথিবীর সবকিছুকে যেন আড়াল করে দেয়। আবার পূর্ণিমা আসে। কোমল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গোটা জগৎ। এ সবই নিয়মশৃঙ্খলাকে মান্য করেই ঘটছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই ছন্দপতন ঘটবে পৃথিবীর। মানুষও স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে ফেলবে। শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যে প্রাণিজগতেও আছে শৃঙ্খলা। তাদের আহার, বিহার, বাসস্থান সবকিছুতে যদি শৃঙ্খলা না থাকত তাহলে বনের প্রাণীরা নেমে আসত হাট-বাজারে, পাখিরা গান গাইত অন্য কোনো স্থানে।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ : ছাত্রজীবনে মানুষ যা কিছু শেখে, যা কিছু অর্জন করে এর প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায়। শৃঙ্খলাবোধ মানুষকে সুনিয়মে চালিত করে বলে ছাত্রজীবনে এর চর্চা থাকলে কোনো ছাত্রের জীবনেই অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে না। কিন্তু যে ছাত্র নিয়ম পালন করে না তার পক্ষে যথাসময়ে যথা কাজ করা অসম্ভব। ফলে পিছিয়ে যেতে যেতে ছাত্রের মনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণার জন্ম হয়। সে উদ্যম হারিয়ে নিজের জীবনকে অর্থহীন করে তোলে, এমনকি বিপথগামী হওয়াও তার পক্ষে সহজ। শৃঙ্খলা নেই এমন ছাত্র ছাত্রমহলে এবং শিক্ষকমহলে সমাদৃত হয় না। অন্যদিকে শৃঙ্খলাবোধে উজ্জীবিত ছাত্র শিক্ষকের স্নেহ আনুকূল্য লাভ করে জীবনকে উন্নত করার সুযোগ পায়। তাই ছাত্রজীবনেই শৃঙ্খলাবোধে জাগ্রত হওয়া অত্যাবশ্যক।

সমাজ ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা : মানুষের সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন। একটি সমাজে শৃঙ্খলা না থাকলে এর সুন্দর কাঠামোটি ভেঙে যায়। সমাজজীবনে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে একটি উচ্ছৃঙ্খল গোত্রের আবির্ভাব হতে পারে। এর ফলে সমাজে অত্যাচার, লুণ্ঠন এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, সেখানে যে কেউ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের মানুষের ওপর ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ঘটে। আর এ কারণেই সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই সমাজজীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এভাবে জাতীয় জীবনেও রয়েছে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মধ্যে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর অকার্যকর রাষ্ট্র মানেই অরাজকতা এবং সীমাহীন দুর্নীতি। শৃঙ্খলাপূর্ণ জাতি খুব দ্রুত উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। শৃঙ্খলাকে সভ্য সমাজের একটি লক্ষণ বলা যেতে পারে। তাই জাতির জাতীয় অগ্রগতির প্রয়োজনে এবং সভ্য সমাজের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের সকলেরই নিয়ম শৃঙ্খলাকে জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : মানবজীবনকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে চাই অনুকূল পরিবেশ। আর শৃঙ্খলা জীবনে বয়ে আনে সে অনুকূল পরিবেশ। শৃঙ্খলাবোধ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় সুন্দর আগামীর দিকে। শৃঙ্খলার গুরুত্বটি অনুধাবন সহজ হয় সৈনিক জীবনের দিকে তাকালেই। বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করতে গিয়ে কঠোরভাবে মেনে চলে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে যুদ্ধের মাঠে পরাজয় অবধারিত হয়ে যায়। তাই সৈনিকজীবনের উদয়াস্ত সমস্তই শৃঙ্খলাপূর্ণ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো প্রভূত উন্নতি করছে শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করে। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম : শৃঙ্খলাবোধ সবারই কাম্য। আর শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম অশান্তি। যে সমাজ শৃঙ্খলাবর্জিত সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।। শৃঙ্খলা নেই এমন সমাজে যে কেউ আইনকে তার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। ফলে দুর্বল মার খায় সবলের হাতে। সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের জন্য অশান্তি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই শৃঙ্খলার চর্চা নেই। যে কারণে যুগ যুগ ধরে উন্নতির চেষ্টা করেও তারা উন্নতির সাক্ষাৎ পাচ্ছে না; বরং দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে চরমপন্থিদের বিদ্রোহ। শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য নেই বলেই আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অনেক দেশের অর্ধেক শাসনভার সরকারের হাতে, অন্য অর্ধেক বিদ্রোহী চরমপন্থিদের হাতে। এ পরিস্থিতি কল্যাণ রাষ্ট্রের সভ্য জাতির লক্ষণ হতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের উচিত নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হলে তার উপযুক্ত তদারকি করা। আর আইন শৃঙ্খলা অমান্যকারীদের আইনের আওতায় আনতে পারলেই জাতি ভয়াল পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে।

উপসংহার : শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণে সুনাগরিকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবনকে সাফল্যে ভরে দিতে শৃঙ্খলা অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সুনাগরিকের ব্যক্তিসাফল্য বৃহৎ অর্থে জাতীয় সাফল্যের নামান্তর। তাই জাতীয় জীবনে অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন সুনাগরিক অত্যাবশ্যক।

৬. খ. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রম পরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানবসভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে।

সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।

৬. গ. **ভূমিকা :** প্রকৃতির রূপ বড়োই বিচিত্র। প্রকৃতি মানুষের জন্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার এ প্রকৃতিই মানুষের জীবনে দুর্যোগ বয়ে আনে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, খরা, মহামারি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদ বিনষ্ট হয়। মানুষ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তবে আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। নানা কারণে বাংলাদেশে বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী : দুর্যোগ বলতে আমরা বুঝি, যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে বোঝায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক উপাদানের চরম অস্বাভাবিক অবস্থা, যাতে মানবসমাজ বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাই প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ বা অবস্থা। বাংলাদেশে হয় এমন প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

ঝড় : পৃথিবীর অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও তীব্র বাতাস ও বজ্র বিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টিপাত ঝড়ের সাধারণ চিত্র। এসময় সমুদ্র থাকে উত্তাল।

ঘূর্ণিঝড় : ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের তীব্রতা হয় অনেক বেশি। কখনো কখনো ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যায়। সমুদ্রে সৃষ্টি হয় জলোচ্ছ্বাসের। প্রতিবছরই এপ্রিল থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বরে বাংলাদেশে ছোটো বড়ো ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। প্রবল শক্তিসম্পন্ন এ ঝড়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালির উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমুদ্রতীরবর্তী দ্বীপসমূহ। ১৯৭০ সালে মেঘনা মোহনায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, গবাদিপশু ও ফসলেরও ক্ষতি হয় প্রচুর। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, প্রায় ছয় শত কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে শক্তিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। এর ফলে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশ্বের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টর্নেডো : বাংলাদেশে টর্নেডো আঘাত হানে সাধারণত এপ্রিল মাসে, যখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ থাকে। এটি স্বল্পকালীন দুর্যোগ, আঘাতও হানে স্বল্প এলাকা জুড়ে। কিন্তু যেখানে আঘাত হানে সেখানে মাত্র দশ-বিশ মিনিটের মধ্যেই ঐ এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

কালবৈশাখী ঝড় : কালবৈশাখী সাধারণত এপ্রিল-মে মৌসুমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এর গতিবেগ সাধারণত ৪০–৬০ কিলোমিটার হয়ে থাকে। ব্যাপ্তিকালও স্বল্প, কখনো কখনো এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। কালবৈশাখী সাধারণত আঘাত হানে শেষ বিকেলের দিকে। মাঝে মাঝে এ ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়।

বন্যা : বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয়। বন্যায় এদেশের এক বিস্তৃর্ণ ভূ-ভাগ প্লাবিত হয়। ঋতুগত কারণে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নদ-নদীর পানি বেড়ে যায় এবং নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও পাহাড়ি ঢল, জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের কারণে বাংলাদেশে বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় প্রাণহানি কম হলেও সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অনেক গবাদিপশু মারা যায়। বন্যাপরবর্তী সময়ে খাদ্যাভাব এবং নানারকম রোগব্যাধি দেখা দেয়। গৃহহীন হয়ে পড়ে অনেক লোক। বাংলাদেশে ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে সৃষ্ট বন্যায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে বন্যার পরপরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তাতে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। ২০১৮, ২০১৯ সালেও এদেশের কোথাও কোথাও ব্যাপক বন্যা হয়।

নদীভাঙন : বাংলাদেশে প্রতিবছর নদীভাঙনের ফলে বসতভিটা ও ফসলি জমি নদীর বুকে বিলীন হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক সহায় সম্বলহীন হয়ে গ্রাম থেকে শহরে আশ্রয় নেয়।

ভূমিধস : ভূমিধস পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি পাহাড়ি এলাকায় বর্ষা মৌসুমে মাঝে মাঝে পাহাড় ধসে পড়ে। পাহাড়ের কোলঘেঁষে গড়ে ওঠা অনেক ঘরবাড়ি চাপা পড়ে, ঘটে প্রাণহানি। নির্বিচারে ও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পাহাড় কাটার কারণেও ভূমিধস হয়। ভূমিধসের কারণে পাহাড়ি এলাকায় সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ভূমিকম্প : ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ ও মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও আসাম এলাকায় ১৮৯৭ সালে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় দেড় হাজার মানুষ মারা যায়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এ ধরনের ভূকম্প একই এলাকায় একশ থেকে একশ ত্রিশ বছর পর আবার আঘাত হানতে পারে। এছাড়া প্রতি বছর ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকায় এক বা একাধিক মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

আর্সেনিক দূষণ : ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলার অধিবাসীরা মারাত্মক আর্সেনিক দূষণের শিকার।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকার : প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবেই প্রাকৃতিক। এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে নিম্নোক্তভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায় :

১. এদেশের বন্যা সমস্যা মোকাবিলার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বনায়ন করা এবং নদীর পানি বহন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নদী খনন করা যেতে পারে।

২. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে লোকজনকে দ্রুত সরিয়ে নিতে হবে নিরাপদ স্থানে। প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

৩. ভূমিকম্প হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। ধ্বংসযজ্ঞ হলে দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষ অসহায়। তবু অদৃষ্টবাদী হয়ে বসে না থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা যেমন থাকা জরুরি তেমনি ব্যাপক জনসচেতনতারও প্রয়োজন।

বরিশাল বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির উদাহরণ কোনটি?
ক) কুলটা খ) গোষ্পদ
গ) একাদশ ঘ) বৃহস্পতি

২. পূরণবাচক সংখ্যাবাচক শব্দ কয় ধরনের হয়?
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

৩. 'চশমা' কোন ভাষার শব্দ?
ক) ফারসি খ) আরবি
গ) ফরাসি ঘ) পর্তুগিজ

৪. 'শয়ন' কোন প্রকারের বিশেষ্য পদ?
ক) গুণবাচক খ) ক্রিয়াবাচক
গ) সমষ্টিবাচক ঘ) বস্তুবাচক

৫. দুই পক্ষের সহযোগিতা বা নির্ভরতা বোঝাতে কোন ধরনের সর্বনাম ব্যবহৃত হয়?
ক) সাপেক্ষ খ) সফলবাচক গ) পারস্পরিক ঘ) নির্দেশক

৬. রাখাল গোরুকে ঘাস খাওয়ায়– এ বাক্যটিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াটি কোন প্রকার ক্রিয়ার উদাহরণ?
ক) নাম ক্রিয়া খ) সংযোগ ক্রিয়া
গ) প্রযোজক ক্রিয়া ঘ) যৌগিক ক্রিয়া

৭. অনুসর্গকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

৮. 'কখন আসা হলো?'– এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?
ক) কর্তাবাচ্য খ) কর্মবাচ্য
গ) ভাববাচ্য ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য

৯. প্রত্যক্ষ উক্তিতে চিরন্তন সত্যের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কীসের পরিবর্তন হয় না?
ক) উদ্ধার চিহ্নের খ) ক্রিয়ার কালের
গ) ভাব-বিশেষ্যের ঘ) নাম-বিশেষ্যের

১০. একটি শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে যে ছবি বা বোধ জেগে ওঠে, সেটাই শব্দটির–
ক) বাচ্যার্থ খ) লক্ষ্যার্থ গ) বাগ্‌ধারা ঘ) বাগর্থ

১১. 'ইতর বিশেষ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
ক) অপদার্থ খ) পার্থক্য গ) বেহিসেবি ঘ) ভণ্ড

১২. 'বাতাস' শব্দটির সঠিক প্রতিশব্দ কোনটি?
ক) দামিনী খ) উদক গ) অনিল ঘ) চপলা

১৩. 'ত্বরিত' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক) দ্রুত খ) শ্লথ গ) গতি ঘ) যান

১৪. 'ধাতৃ' শব্দের অর্থ 'বিধাতা' হলে, 'ধাত্রী' শব্দের অর্থ কী?
ক) পৃথিবী খ) ধারণ
গ) দাই ঘ) ধুম

১৫. কোনটি বাগ্‌যন্ত্রের সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ?
ক) দন্তমূল খ) জিভ
গ) তালু ঘ) ওষ্ঠ

১৬. বাংলা ভাষায় কতটি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে?
ক) ৭টি খ) ১০টি গ) ৩০টি ঘ) ৩৭টি

১৭. জিভের সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী সম্মুখ স্বরধ্বনি কোনগুলো?
ক) এ, ও খ) অ, ও গ) অ্যা, অ ঘ) ই, এ

১৮. উচ্চারণ স্থান অনুসারে উষ্ম ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়?
ক) দন্তমূলীয়, তালব্য, কণ্ঠনালীয় খ) দন্তমূলীয়, কণ্ঠনালীয়, পার্শ্বিক
গ) তালব্য, কণ্ঠনালীয়, নাসিক্য ঘ) কণ্ঠনালীয়, দন্তমূলীয়, মূর্ধণ্য

১৯. কোন শব্দটিতে 'এ' বর্ণের 'অ্যা' উচ্চারণ ঘটেছে?
ক) একটি খ) দেশ
গ) এলো ঘ) একটা

২০. 'আরক্ত' শব্দে 'আ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) সদৃশ খ) ঈষৎ গ) পর্যন্ত ঘ) সম্যক

২১. 'আগত' অর্থে প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি?
ক) দখিনা খ) ঢাকাই গ) নেয়ে ঘ) গেঁয়ো

২২. পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে তাকে কোন ধরনের বহুব্রীহি সমাস বলে?
ক) ব্যতিহার বহুব্রীহি খ) ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি
গ) পদলোপী বহুব্রীহি ঘ) সমানাধিকার বহুব্রীহি

২৩. 'খুব যে বলেছিলেন আসবেন'– এ বাক্যে 'যে' কোন ক্রিয়া বিশেষণের উদাহরণ?
ক) পদাণু খ) কালবাচক
গ) ধরনবাচক ঘ) স্থানবাচক

২৪. "এত পড়লাম, কিন্তু পরীক্ষায় ভালো করতে পারলাম না।" বাক্যটিতে কোন যোজক ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) সাধারণ যোজক খ) বিকল্প যোজক
গ) কারণ যোজক ঘ) বিরোধ যোজক

২৫. বাক্যে গৌণ কর্মের সাথে সাধারণত কোন বিভক্তি বসে?
ক) –কে, –রে খ) –এ, –তে
গ) –র, –এর ঘ) –য়ের, –এর

২৬. যাকগে, ওসব কথা থাক। বাক্যটিতে কোন ধরনের আবেগ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে?
ক) বিরক্তি খ) অলংকার
গ) সম্বোধন ঘ) সিদ্ধান্ত

২৭. সাধারণ ক্রিয়ার ঘটমান অতীতকালে শ্রোতা পক্ষের ঘনিষ্ঠার্থক ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?
ক) –ছিলে খ) –ছিলাম গ) –ছিলি ঘ) –ছিল

২৮. 'তুমি চেষ্টা না করায় ব্যর্থ হয়েছো'– এটি কোন বাক্যের উদাহরণ?
ক) সরল বাক্য খ) জটিল বাক্য
গ) মিশ্র বাক্য ঘ) যৌগিক বাক্য

২৯. বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষ্য অংশকে কী বলা হয়?
ক) প্রসারক খ) উদ্দেশ্য গ) যোজক ঘ) পূরক

৩০. 'কাপটা উঁচু টেবিল থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল।'– রেখাঙ্কিত অংশটি কোন কারকের উদাহরণ?
ক) কর্তা কারক খ) কর্ম কারক
গ) অপাদান কারক ঘ) অধিকরণ কারক

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) স্বাধীনতা দিবস

(খ) কম্পিউটার।

২। (ক) মনে করো, তুমি সুমন/সুমনা। একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি সাহেদ/সাদিয়া। রংপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। অনুপস্থিতির কারণে ছুটি চেয়ে তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান। অতএব কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভান্ডার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা শ্রেয়। প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সর্পের মস্তকে মণি থাকে। মণি মূল্যবান পদার্থ বটে। কিন্তু তাই বলিয়া যেমন মণি লাভের নিমিত্ত বিষধর সর্পের সাহচর্য করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে, সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় বিষয় হইলেও বিদ্যালাভের নিমিত্ত বিদ্বান দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নহে।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর!
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।

৪। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।

অথবা,

(খ) মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে,
হারা শশীর হারা হাসি, অন্ধকারেই ফিরে আসে।

৫। (ক) মনে করো, তুমি শফিক/শেফালী। 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার দিনাজপুর প্রতিনিধি। তোমার এলাকার সড়কের দুরবস্থা সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি মাসুম/মাসুমা। ঠাকুরগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তোমার বিদ্যালয়ের নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) কৃষিকাজে বিজ্ঞান

(খ) ভাষা-আন্দোলন

(গ) সময়ানুবর্তিতা।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	⓪খ	২	খ	৩	ক	৪	খ	৫	গ	৬	গ	৭	ক	৮	গ	৯	খ	১০	ক	১১	খ	১২	গ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	খ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	গ

রচনামূলক

১. ক. ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। এটা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ সত্ত্বেও স্বৈরাচার পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় এদেশের জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পাক-সরকার জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকহানাদার বাহিনী কামান, গুলি, ট্যাংক নিয়ে ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। এরই প্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর এ দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সব ভবনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়। ভোরবেলা গণজমায়েত হয় বিভিন্ন প্রাঙ্গণে, শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং রেডিও-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এভাবে সমগ্র দেশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে দিবসটি অত্যন্ত গৌরবের ও মর্যাদার।

১. খ. কম্পিউটার ইংরেজি ভাষার শব্দ। এটি ল্যাটিন শব্দ কমপুটেয়ার (Computare) থেকে উৎপত্তি হয়েছে; যার ইংরেজি অর্থ কম্পিউট (Compute) বা গণনা করা। সে হিসেবে কম্পিউটারের অর্থ গণনাকারী যন্ত্র। কিন্তু বর্তমানে কম্পিউটার শুধু গণনাকারী যন্ত্র নয়। এটি বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা মানুষের দেওয়া তথ্য যুক্তিসঙ্গত নির্দেশের ভিত্তিতে অতি দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে গণনার কাজ করে তার সঠিক ফলাফল প্রদান করতে পারে। কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে– মুদ্রণ করা, লেখাপড়া করা, তথ্য সংরক্ষণ করা, খেলা করা, গান শোনা, সিনেমা দেখা, টেলিফোন করা, দেশ-বিদেশের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করা ইত্যাদি। ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আধুনিক জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্র এটি। বৈদ্যুতিক কম্পিউটারগুলো দুধরনের হয়ে থাকে। যথা : ১. এনালগ, ২. ডিজিটাল। এনালগ কম্পিউটার ফিজিক্যাল গুণাবলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ডিজিটাল কম্পিউটারগুলো সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। মূলত কম্পিউটার মানুষের মস্তিষ্কের বিকল্প হিসেবে মানবকল্যাণে অনেক কাজ করে চলছে এবং মানুষের শক্তি ও সময়ের অপচয় রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সংসার খরচের হিসাব বা বাচ্চাদের গেম থেকে শুরু করে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে এটি। তাই কম্পিউটার আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। মানুষ ক্রমেই কম্পিউটার নির্ভর হয়ে পড়ছে।

২. ক.

২৫শে মে, ২০২...
পীরগাছা, রংপুর।

প্রিয় রায়হান,

শুরুতেই শুভেচ্ছা নিয়ো। অনেক দিন তোমার কোনো চিঠিপত্র পাচ্ছি না। আশা করি সবাইকে নিয়ে ভালো আছ। গত 'মাঘী পূর্ণিমার' ছুটিতে আমি আর সুব্রত বগুড়া জেলায় অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড় দেখতে গিয়েছিলাম। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন পুরাকীর্তি বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য নিদর্শন ও ভাস্কর্য সম্পর্কে শুধু বইতে পড়েছি। এবার স্বচক্ষে দেখে মুগ্ধ হলাম। প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের কথা চিঠিতে লিখে ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব কি না জানি না। তবুও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের আনন্দঘন অভিজ্ঞতা তোমার সাথে ভাগ করে নিতেই কলম ধরলাম।

দিনটি ছিল মঙ্গলবার। সকাল সাতটায় নাস্তা খেয়ে আমরা দুজন মহাস্থানগড়ের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। রংপুর থেকে বেশি দূরে নয় বলে পৌঁছাতে সময় লাগল না। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে ভগ্নপ্রায় বিরাট দ্বিতল ইমারত। সামনে বিশাল পুকুর। চারপাশে সারি সারি গাছ। পুরাতন সেই ইট-পাথরের প্রতিমূর্তি বাংলার অবলুপ্ত শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাস্তার দুপাশে রয়েছে পুরানো অট্টালিকা। প্রাচীন যুগের কিছু স্থাপত্য নিদর্শন এবং ইতিহাসের উত্থান-পতনের কাহিনি। এসব দেখতে দেখতে যেন অতীতে হারিয়ে গেলাম। সময় পেলে তুমিও একবার দেখতে এসো বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড়। ভালো লাগবে। তোমার লেখাপড়া কেমন চলছে? ভালো থেকো। তোমার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
সুমন

[**বি. দ্র. :** পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

২. খ. ২০শে মে, ২০২...

বরাবর

প্রধান শিক্ষক,

রংপুর উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর।

বিষয় : অনুপস্থিতির জন্য ছুটির আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির একজন নিয়মিত ছাত্রী। গত ১৫ই মে থেকে ১৯শে মে ভীষণ জ্বর থাকায় আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারিনি।

অতএব, মহোদয় সমীপে সদয় প্রার্থনা, আমাকে উল্লিখিত পাঁচ দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

বিনীত

আপনার অনুগত ছাত্রী

সাদিয়া

দশম শ্রেণি, ক্রমিক নং-২

৩. ক. বিদ্যার চেয়ে বড়ো সম্পদ আর নেই। তবে তার চেয়েও বড়ো সম্পদ চরিত্র। চরিত্রহীন মানুষ যত বড়ো বিদ্বান হোক না কেন, সে পশুর চেয়ে অধম। তার থেকে দূরে থাকাই উত্তম।

৩. খ. স্বর্গ ও নরক কেবল পরলোকের ব্যাপার নয়। ইহলোকেও তা বিরাজমান। বিবেকহীন মানুষের অপকর্ম ও বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে জগৎ হয়ে ওঠে নরকতুল্য। অন্যদিকে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধনে মিলেমিশে বসবাস করলে যে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে তখন জগৎ হয়ে ওঠে স্বর্গীয় সুষমাময়।

৪. ক. এ পৃথিবীতে সুন্দর কর্মের জন্যই মানুষ মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে। অক্ষয় হয়ে থাকে তার মহৎ কর্মগুলো।

এ কথা চিরন্তন সত্য যে, মানুষ মরণশীল। তার দেহ একদিন মাটির সাথে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু এ নশ্বর পৃথিবীতে সে আপন কীর্তির মহিমায় অমরত্ব লাভ করতে পারে। মানুষ শুধু আহার-নিদ্রায়, ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। তার জন্মের মূলে নিশ্চয় স্রষ্টার একটা মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। নইলে মানুষকে বুদ্ধি না দিয়ে পশুর মতো করেই পৃথিবীতে পাঠানো হতো। মানুষের বুদ্ধিমত্তা আছে বলেই সে শুধু আত্মকল্যাণে জীবন কাটিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হতে পারে না, জনকল্যাণের মাঝে নিয়োজিত রেখেই সে তার মানুষ নামের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। ফলে এই জনকল্যাণের মাপকাঠি দিয়েই মানুষের জীবনের মূল্য পরিমাপ করা হয়ে থাকে। যে স্বার্থপর লোক শুধু নিজের সুখের জন্য কাজ করে এবং তার চারপাশের যেসব অসহায় নর নারী রয়েছে; তাদের দুঃখ মোচনের জন্য কোনো কিছুই করে না। মৃত্যুর সাথে সাথেই তার স্মৃতি চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যায়। তার জন্য কেউ শোক জ্ঞাপন করে না এবং তার কথা কেউ কোনো দিন মনে রাখে না। পক্ষান্তরে অন্যের জন্য যারা অকাতরে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, মৃত্যুর পরও তার কীর্তির কথা, তার মহত্ত্বের কথা কেউ ভোলে না। সে সকলের নিকট স্মরণীয়, বরণীয় হয়ে থাকে। মানুষ তার কর্মকে প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধা করে ।

মানুষ পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত বয়সকালের মধ্যে নয়; বরং তার সুকর্মের স্মৃতিতে যুগ যুগ বেঁচে থাকে।

৪. খ. হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন। দুঃখের সময় ভেঙে পড়লে চলবে না। কেননা দুঃখের পরেই আসে সুখ। দুঃখের পাশাপাশি সুখ আসবে এটাই স্বাভাবিক।

জগৎ সংসারে মানুষ সর্বদাই সুখের কাঙাল, মানুষের প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তই সুখের হয়ে উঠুক এটাই প্রার্থিত। দুঃখকে পরিহার করার সংগ্রামেই মানুষ প্রতিনিয়ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুখ অর্জনের জন্য কষ্টের প্রয়োজন। আর এই কষ্টই হলো দুঃখকে বরণ করে নেওয়া। আর এ দুঃখের রজনী যতই গভীর হয় সুখের অভ্যুদয় ততই নিকটবর্তী হয়ে আসে। পতঙ্গ আনন্দ বিহারে যতই ঊর্ধ্ব গগনে উড়তে থাকে, ততই এর পতনের মুহূর্ত নিকটবর্তী হতে থাকে। দুঃখের রাত্রি পার হয়েই আসে আনন্দঘন সুপ্রভাত। সুখ মানুষকে আনন্দ দেয়। তাই সুখের প্রতিই তার পক্ষপাতিত্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুঃখ হতেও যে অমৃত লাভ করা যায়, মানুষ তা অনুভব করে না। বাস্তব জীবনেও দুঃখ কষ্টের প্রয়োজন আছে। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পতিব্রতের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়েই মানুষের চিত্ত শুচিশুভ্র হয়ে ওঠে, মানুষ নতুনতর মহিমান্বিত জীবন লাভ করে। সুতরাং দুঃখের পথ বেয়েই আসে সুখ শান্তির আয়োজন। মেঘ যতই গভীর ও ঘনতর হয়ে আসুক না কেন, সূর্যকে গ্রাস করবার বা অবলুপ্ত করবার মতো ক্ষমতা তার নেই। মেঘ সব সময় থাকে না। মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য হেসে উঠবেই। পতনোন্মুখ তরঙ্গও আবার পরক্ষণে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। অমাবস্যার যে অন্ধকার চাঁদকে সাময়িকভাবে গ্রাস করেছে তার পরদিনই হেসে ওঠে নতুন চাঁদ। শীত চিরস্থায়ী নয়। শীতের পর বসন্ত আসবেই।

সুতরাং মানুষকে দুঃখরূপ কালো মেঘের ঘনঘটায় ভেঙে পড়লে চলবে না, বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসে তার মোকাবিলা করতেই হবে। মনে রাখতে হবে, দুঃখের কালো মেঘ কেটে এক সময় সুখের সোনালি সূর্য হেসে উঠবেই।

৫. ক. **সড়কের বেহাল দশা : যাত্রীদের দুর্ভোগ**

শফিক, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর, ২২শে জুলাই ২০২...॥ দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার সড়কটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে সড়কটির কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। সড়কের এ বেহাল দশায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, দীর্ঘ সড়কটির পুরোটাই বড়ো বড়ো গর্ত ও খানাখন্দে ভরা। এমনকি দুই কিলোমিটার অংশে দুই পাশের মাটি সরে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে হাজার হাজার মানুষ চলাচল করে। এছাড়া কমপক্ষে ত্রিশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পথে যাতায়াত করে থাকে। এলাকাবাসী জানান, সড়কটির সুরকির স্তর দেবে গিয়ে বালু বের হয়ে আসে এবং সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। এরপর প্রতি বর্ষায় বৃষ্টিপাতে পানি ও কাদায় সড়কটি একাকার হয়ে যায়, যা এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি পিকআপ ভ্যান রাস্তার গর্তে পড়ে যায়। এতে চালকসহ তিন জন যাত্রী আহত হন।

চিরিরবন্দর উপজেলার সাধারণ মানুষ মনে করে, সড়কটি নিয়ে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। অথচ এর সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এটি মেরামতের জন্য স্থানীয় লোকজন সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনো প্রতিকার পায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৫. খ. ২৫শে জানুয়ারি, ২০২...

বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
ঠাকুরগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও।

বিষয় : স্কুলে উদ্‌যাপিত নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন।

সূত্র : ঠা.আ.উ. বি, ২০২.../২/(২৮)

মহোদয়,

ঠাকুরগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরির জন্য আদিষ্ট হয়ে নিচের প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করছি।

গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২... ঠাকুরগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল আহাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীরা। তারপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ওই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সরোজ মোস্তফা। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়। বক্তব্য প্রদান করে বিজ্ঞান বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থী অপু ও মিতু, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত ও আবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবীণ শিক্ষার্থী হাসান ও রফিক। এসময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেকে তাদের দীর্ঘদিনের ছাত্রজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে চোখ অশ্রুসজল করে ফেলে। অনেকে আবার স্কুলজীবনের মজার স্মৃতিগুলো সবার সামনে তুলে ধরে। শিক্ষকরা খুব মন দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের নির্ভীকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের ভালো ফল প্রত্যাশা করেন। এরপর অতিথিরা স্মারক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। স্কুলের মাঠে নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবাগত শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের একটি উষ্ণ ভাববিনিময় হয়। ভবিষ্যতে এই স্মৃতিগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : মাসুম, মানবিক বিভাগ, দশম শ্রেণি
প্রতিবেদনের শিরোনাম : ঠাকুরগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান
প্রতিবেদনের ধরন : বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদন রচনার তারিখ ও সময় : ২৫শে জানুয়ারি, ২০২...; রাত ৯টা।

৬. ক. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রম পরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানবসভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।

৬. খ. ভূমিকা : ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগঠিত আন্দোলনই ভাষা-আন্দোলন, যা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ বাংলা ভাষাপ্রেমীদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। অবশ্য এ আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল আরও আগে, অন্যদিকে এর প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রকৃত বিচারে ভাষা-আন্দোলন বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে, অন্যদিকে সমগ্র বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়। এটি একইসঙ্গে ছিল তৎকালীন পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। বলা যায়, ভাষা-আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের বীজমন্ত্র।

ভাষা-আন্দোলনের প্রথম পর্যায় : ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ– পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান। প্রায় দুই হাজার কিলোমিটারের অধিক দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক থেকে অনেকগুলো মৌলিক পার্থক্য ছিল। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের বৈঠকে ইংরেজি ও উর্দুভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের অধিকার সংক্রান্ত এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গড়ে ওঠে তমদ্দুন মজলিস ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১০ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ধর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্ত হয়। ১১ই মার্চ পালিত সেই ধর্মঘটে পিকেটিংয়ের সময়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে ২১শে মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় এক ভাষণে ঘোষণা করেন; 'উর্দু একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। ২৪শে মার্চ ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে গিয়েও তিনি একই বক্তব্য রাখেন। যখন তিনি উর্দুর ব্যাপারে তাঁর অবস্থানের কথা পুনরুল্লেখ করেন, উপস্থিত ছাত্ররা সমস্বরে 'না, না' বলে চিৎকার করে ওঠে। তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘোষণার প্রতিবাদে তারা বলে, উর্দু নয় বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যেও গভীর ক্ষোভের জন্ম হয়। বাংলা ভাষার সম-মর্যাদার দাবিতে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে।

ভাষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আবারও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২৯শে জানুয়ারি সিদ্ধান্ত হয়, ঢাকা শহরে প্রতিবাদী মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সমগ্র পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি ও ধর্মঘটের আহ্বান করে। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে। ফলে দিনটিতে ঢাকা শহরে সকল প্রকার মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু এ আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৯টা থেকে সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে চায়। তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ অস্ত্র হাতে সভাস্থলের চারদিক ঘিরে রাখে। বেলা সোয়া এগারোটার দিকে ছাত্ররা একত্র হয়ে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ বন্ধ করতে অনুরোধ জানান এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময়ে কয়েকজন ছাত্রকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আরও অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। শহিদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। শোকাবহ এ ঘটনার অভিঘাতে সমগ্র পূর্ব বাংলায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

২১শে ফেব্রুয়ারি-পরবর্তী আন্দোলন : ২১শে ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং সভা-শোভাযাত্রাসহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান শফিক। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়। শহিদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে ওইদিন বিকেল থেকে রাত অবধি কাজ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্ররা নির্মাণ করে ভাষা-আন্দোলনের প্রথম শহিদ মিনার। ২৪শে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারটি উদ্‌বোধন করেন বাইশে ফেব্রুয়ারি শহিদ হওয়া শফিউর রহমানের পিতা। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারটি উদ্‌বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কাশেম শামসুদ্দীন।

ভাষা-আন্দোলনের অর্জন : ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন ভাষাকেন্দ্রিক হলেও তা পুরো বাঙালি জাতিকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। এর ফল হিসেবে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ব্যবধানে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। একুশের চেতনাকে ধারণ করে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতাহার ছিল ২১ দফা সংবলিত। ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনের মুখে ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো বাংলা ভাষা-আন্দোলন, মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, যা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটির এই আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নতুন গতি লাভ করে। রচিত হয় ভাষা-আন্দোলনকেন্দ্রিক অনেক কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় একুশের প্রথম সাহিত্য সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রকাশিত হয়। একই বছর মুনীর চৌধুরী কারাগারে বসে 'কবর' নাটক রচনা করেন। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী লেখেন গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতা রচনা করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী; শামসুর রাহমান রচনা করেন 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'; আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচনা করেন 'মাগো, ওরা বলে' কবিতা। জহির রায়হান একুশকে নিয়ে রচনা করেন উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন'। এছাড়া ওই সময়পর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে চর্চার অন্যতম অনুপ্রেরণা।

ভাষা-আন্দোলনের তাৎপর্য : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান তাৎপর্য এই যে, বাঙালি জাতি তার জাতীয়তাবোধ ও অধিকার সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয়। ভাষার প্রশ্নে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এর ফলে পূর্ব বাংলায় গড়ে ওঠে একটি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এরপর যত আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে তার পেছনে কাজ করেছে ভাষা-আন্দোলনের উজ্জ্বল স্মৃতি। ভাষা-আন্দোলনের প্রেরণায় ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ছয় দফা এবং ১৯৬৯-র গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা ছিল ভাষা-আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। এখনও সেই লক্ষ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

উপসংহার : একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতিসত্তার পরিচয় নির্দেশক দিন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বীর ভাষা-শহিদদের অবদান জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তবে তাঁদের আত্মদান তখনই সার্থক হবে, যখন বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে।

৬. গ. **ভূমিকা :** মানবজীবনে সময়ানুবর্তিতা তথা শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নিয়মের অনুবর্তী হয়ে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাই শৃঙ্খলা। আর শৃঙ্খলাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ এবং তা চর্চার মধ্য দিয়েই জন্ম হয় শৃঙ্খলাবোধের। এটি জীবনের সবকিছুকেই সার্থক করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবোধ শান্তিময় স্বাভাবিক জীবন বয়ে আনতে সহায়তা করে।

শৃঙ্খলা কী : সাধারণত নিয়ম-কানুনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং তার অনুসরণ করাই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলাবোধ শুধু রাষ্ট্রীয় কিছু বিধিনিষেধকে গ্রহণ বা বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অলিখিত কিছু রীতি আছে, যা মানুষকে মেনে চলতে হয়। জগতের সকল কাজের সাথেই শৃঙ্খলা জড়িত, এমনকি বিশ্বজগতের বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যেও শৃঙ্খলার বিষয়টি স্পষ্ট। ঘরে, বাইরে, রাষ্ট্রে যেখানেই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হয়েছে সেখানেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতির রাজত্বে শৃঙ্খলা : শৃঙ্খলাবোধ মানবজীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বিশ্বপ্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিদ্যমান। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা সবকিছুই চলছে নিয়মের মধ্য দিয়ে। এভাবে নিয়মকে অনুসরণ করছে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র। পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামে, ঝরনা মিলিত হয় নদীতে আর নদী ছোটে সমুদ্রের পানে। নদীর জলে জোয়ার আসে, আসে ভাটাও। বর্ষা আসে, শীত আসে, আসে বসন্ত। পৃথিবী আঁধার করা অমাবস্যা কালো পর্দা টেনে দেয় জগৎ সংসারে। পৃথিবীর সবকিছুকে যেন আড়াল করে দেয়। আবার পূর্ণিমা আসে। কোমল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গোটা জগৎ। এ সবই নিয়মশৃঙ্খলাকে মান্য করেই ঘটছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই ছন্দপতন ঘটবে পৃথিবীর। মানুষও স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে ফেলবে। শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যে প্রাণিজগতেও আছে শৃঙ্খলা। তাদের আহার, বিহার, বাসস্থান সবকিছুতে যদি শৃঙ্খলা না থাকত তাহলে বনের প্রাণীরা নেমে আসত হাট-বাজারে, পাখিরা গান গাইত অন্য কোনো স্থানে।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ : ছাত্রজীবনে মানুষ যা কিছু শেখে, যা কিছু অর্জন করে এর প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায়। শৃঙ্খলাবোধ মানুষকে সুনিয়মে চালিত করে বলে ছাত্রজীবনে এর চর্চা থাকলে কোনো ছাত্রের জীবনেই অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে না। কিন্তু যে ছাত্র নিয়ম পালন করে না তার পক্ষে যথাসময়ে যথা কাজ করা অসম্ভব। ফলে পিছিয়ে যেতে যেতে ছাত্রের মনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণার জন্ম হয়। সে উদ্যম হারিয়ে নিজের জীবনকে অর্থহীন করে তোলে, এমনকি বিপথগামী হওয়াও তার পক্ষে সহজ। শৃঙ্খলা নেই এমন ছাত্র ছাত্রমহলে এবং শিক্ষকমহলে সমাদৃত হয় না। অন্যদিকে শৃঙ্খলাবোধে উজ্জীবিত ছাত্র শিক্ষকের স্নেহ আনুকূল্য লাভ করে জীবনকে উন্নত করার সুযোগ পায়। তাই ছাত্রজীবনেই শৃঙ্খলাবোধে জাগ্রত হওয়া অত্যাবশ্যক।

সমাজ ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা : মানুষের সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন। একটি সমাজে শৃঙ্খলা না থাকলে এর সুন্দর কাঠামোটি ভেঙে যায়। সমাজজীবনে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে একটি উচ্ছৃঙ্খল গোত্রের আবির্ভাব হতে পারে। এর ফলে সমাজে অত্যাচার, লুণ্ঠন এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, সেখানে যে কেউ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের মানুষের ওপর ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ঘটে। আর এ কারণেই সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই সমাজজীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এভাবে জাতীয় জীবনেও রয়েছে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মধ্যে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর অকার্যকর রাষ্ট্র মানেই অরাজকতা এবং সীমাহীন দুর্নীতি। শৃঙ্খলাপূর্ণ জাতি খুব দ্রুত উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। শৃঙ্খলাকে সভ্য সমাজের একটি লক্ষণ বলা যেতে পারে। তাই জাতির জাতীয় অগ্রগতির প্রয়োজনে এবং সভ্য সমাজের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের সকলেরই নিয়ম শৃঙ্খলাকে জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : মানবজীবনকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে চাই অনুকূল পরিবেশ। আর শৃঙ্খলা জীবনে বয়ে আনে সে অনুকূল পরিবেশ। শৃঙ্খলাবোধ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় সুন্দর আগামীর দিকে। শৃঙ্খলার গুরুত্বটি অনুধাবন সহজ হয় সৈনিক জীবনের দিকে তাকালেই। বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করতে গিয়ে কঠোরভাবে মেনে চলে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে যুদ্ধের মাঠে পরাজয় অবধারিত হয়ে যায়। তাই সৈনিকজীবনের উদয়াস্ত সমস্তই শৃঙ্খলাপূর্ণ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো প্রভূত উন্নতি করছে শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করে। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম : শৃঙ্খলাবোধ সবারই কাম্য। আর শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম অশান্তি। যে সমাজ শৃঙ্খলাবর্জিত সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।। শৃঙ্খলা নেই এমন সমাজে যে কেউ আইনকে তার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। ফলে দুর্বল মার খায় সবলের হাতে। সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের জন্য অশান্তি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই শৃঙ্খলার চর্চা নেই। যে কারণে যুগ যুগ ধরে উন্নতির চেষ্টা করেও তারা উন্নতির সাক্ষাৎ পাচ্ছে না; বরং দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে চরমপন্থিদের বিদ্রোহ। শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য নেই বলেই আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অনেক দেশের অর্ধেক শাসনভার সরকারের হাতে, অন্য অর্ধেক বিদ্রোহী চরমপন্থিদের হাতে। এ পরিস্থিতি কল্যাণ রাষ্ট্রের সভ্য জাতির লক্ষণ হতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের উচিত নিয়ম-শৃঙ্খলা লজ্ঘিত হলে তার উপযুক্ত তদারকি করা। আর আইন শৃঙ্খলা অমান্যকারীদের আইনের আওতায় আনতে পারলেই জাতি ভয়াল পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে।

উপসংহার : শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণে সুনাগরিকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবনকে সাফল্যে ভরে দিতে শৃঙ্খলা অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সুনাগরিকের ব্যক্তিসাফল্য বৃহৎ অর্থে জাতীয় সাফল্যের নামান্তর। তাই জাতীয় জীবনে অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন সুনাগরিক অত্যাবশ্যক।

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 102

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. নিচের কোনটি অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ?
ক ন্ট খ স্ট গ হ্ন ঘ স্ফ

২. 'লাউ'– এখানে পূর্ণ স্বরধ্বনি কোনটি?
ক উ খ আ গ ও ঘ এ

৩. অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন নিচের কোনটি?
ক হ খ ধ গ ঠ ঘ দ

৪. 'অতি' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
ক উতি খ অহতি
গ ওতি ঘ য়োতি

৫. 'উপভোগ'– এখানে 'উপ' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক সম্যক খ ছোটো
গ মন্দ ঘ অভাব

৬. টাক + ও = টেকো– এখানে 'ও' প্রত্যয় কী অর্থে ব্যবহার হয়েছে?
ক নিন্দা অর্থে খ যুক্ত অর্থে
গ ভাব অর্থে ঘ জাত অর্থে

৭. যার সাথে তুলনা করা হয় তাকে কী বলে?
ক উপমান খ উপমেয় গ রূপক ঘ অলুক

৮. পরপর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি শব্দকে কী বলে?
ক ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব খ পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব
গ বিভক্তিযুক্ত পুনরাবৃত্ত ঘ অনুকার দ্বিত্ব

৯. পূরণবাচক সংখ্যা শব্দ কয় প্রকার?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

১০. 'দারোগা' কোন ভাষার শব্দ?
ক হিন্দি খ পর্তুগিজ গ তুর্কি ঘ ফরাসি

১১. নিচের কোনটি সাধিত শব্দ?
ক গোলাপ খ গাছ
গ হাত ঘ সম্পাদকীয়

১২. 'ধৈর্য' কোন ধরনের বিশেষ্য?
ক গুণ-বিশেষ্য খ নাম-বিশেষ্য গ বস্তু-বিশেষ্য ঘ সমষ্টি-বিশেষ্য

১৩. অন্যবাচক সর্বনাম কোনটি?
ক সবার খ অমুক গ এই ঘ কিছু

১৪. 'বুঝে নেওয়া' কোন ক্রিয়ার উদাহরণ?
ক সংযোগ ক্রিয়ার খ নাম ক্রিয়ার
গ যৌগিক ক্রিয়ার ঘ প্রযোজক ক্রিয়ার

১৫. স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ কোনটি?
ক যথাসময়ে সে হাজির হয়।
খ আমি কি যাব?
গ সে এখন যাবে না।
ঘ তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

১৬. ক্রিয়াজাত অনুসর্গ কোনটি?
ক আজ বাংলাদেশ বনাম ভারতের খেলা।
খ এমন কাজ তোমার দ্বারা হবে না।
গ সে সঙ্গে যাবে বলে তৈরি হয়ে এসেছে।
ঘ মাথার ওপরে নীল আকাশ।

১৭. নিচের কোনটি বিকল্প যোজক?
ক রহিম ও করিম এই কাজটি করেছে।
খ তাকে আসতে বললাম, তবু এলো না।
গ চা না-হয় কফি খান।
ঘ বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।

১৮. ওগো, তোরা জয়ধ্বনি করো।– এটি কোন ধরনের আবেগ?
ক সম্বোধন আবেগ খ বিস্ময় আবেগ
গ করুণা আবেগ ঘ অলংকার আবেগ

১৯. শুধু মানুষের বেলায় কোন নির্দেশক ব্যবহার হয়?
ক খানা খ টুকু
গ টা ঘ জন

২০. সাধারণত ক্রিয়ার স্থান, কাল, ভাব বোঝাতে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?
ক কে খ তে, য়ে
গ র ঘ এর

২১. রীতা বই পড়বে।– এখানে ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?
ক পড় খ এ গ বে ঘ বই

২২. বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকলে তাকে কী বলে?
ক বিক্রিয় বাক্য খ বেক্রিয় বাক্য
গ অক্রিয় বাক্য ঘ সক্রিয় বাক্য

২৩. উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক কোথায় বসে?
ক বিধেয়ের পূর্বে খ উদ্দেশ্যের পূর্বে
গ উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের পূর্বে ঘ কর্মের পূর্বে

২৪. লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়। এর যৌগিক বাক্য কোনটি?
ক যদিও লোকটি অশিক্ষিত তবু অভদ্র।
খ লোকটি অশিক্ষিত এবং অভদ্র।
গ লোকটি অশিক্ষিত, কিন্তু অভদ্র নয়।
ঘ লোকটি যেমন অশিক্ষিত তেমন অভদ্র।

২৫. কাব্যভাষায় কর্ম কারকে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?
ক 'কে' খ 'রে' গ 'রা' ঘ 'এ'

২৬. শরতে শিউলি ফোটে।– এটি কোন বাচ্য?
ক কর্তাবাচ্য খ কর্মবাচ্য
গ ভাববাচ্য ঘ কর্তা ও কর্মবাচ্য

২৭. পরোক্ষ উক্তিতে কী অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন করতে হয়?
ক কর্ম অনুযায়ী খ কর্তা অনুযায়ী
গ স্বরভঙ্গি অনুযায়ী ঘ পদ অনুযায়ী

২৮. 'বেহায়া' অর্থটি নিচের কোন বাগ্‌ধারা দিয়ে প্রকাশ করা যায়?
ক ঠোঁট কাটা খ ডুব মারা
গ টনক নড়া ঘ চিনে জোঁক

২৯. 'ভবন'-এর প্রতিশব্দ কোনটি?
ক কৃপা খ উদ্ভব
গ লহরী ঘ সদন

৩০. 'তফাত'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক বিপথ খ প্রশংসা
গ কাছে ঘ হ্রস্ব

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) সুন্দরবন

(খ) মোবাইল ফোন।

২। (ক) মনে করো, তুমি ফাহিম/ফাহিমা। তুমি ফরিদপুর জেলার জয়পুর ইউনিয়ন পরিষদের একজন বাসিন্দা। তোমার এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুর্দশার কথা জানিয়ে যে-কোনো জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি জনি সিলেটের বাসিন্দা। 'ঢাকা প্রকাশনীর' বিক্রয় কর্মকর্তা বরাবর ডাকযোগে পুস্তক পাঠানোর জন্য একটি আবেদনপত্র লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস–
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

৪। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।

অথবা,

(খ) ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

৫। যে-কোনো **একটি** বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা করো : ১০

(ক) মনে করো, তুমি ফারদিন/ফারিহা। তুমি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার একজন স্থানীয় প্রতিনিধি। তোমার এলাকার 'সড়কের দুরবস্থা' শিরোনামে যে-কোনো দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি স্বপ্নিল/স্বর্ণা। তুমি ফরিদপুর জিলা স্কুলের দশম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। তোমার বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'নবীন-বরণ' অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে যে-কোনো জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

(খ) কৃষি উদ্যোক্তা

(গ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ⓖ গ	২	খ	৩	ঘ	৪	গ	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	ঘ	৯	খ	১০	গ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ঘ
	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	খ	২১	গ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	গ

রচনামূলক

১. ক. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত বিস্তৃত একটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন নামে পরিচিত। নানা ধরনের গাছপালায় পরিপূর্ণ এই সুন্দরবনে বিচিত্র বন্যপ্রাণী বাস করে। সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় চার হাজার বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবন বিস্তৃত। প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার হিসেবে সুন্দরবন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখান থেকে সংগৃহীত হয় নানা ধরনের কাঠ, মধু, মোম ও মৎস্য। প্রায় চারশো নদী ও খাল এবং প্রায় দুইশো দ্বীপ রয়েছে সুন্দরবনে। সুন্দরবনে যেসব গাছ জন্মে এর মধ্যে সুন্দরী, গোলপাতা, কেওড়া, গেওয়া, গরান, বাইন, ধুন্দুল, পশুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বনে বাস করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, বন্য শূকর, বানর, বনবিড়াল, সজারু ইত্যাদি বন্যপ্রাণী। বিচিত্র প্রজাতির পাখির কলকাকলিতে সুন্দরবন মুখর থাকে। ১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

১. খ. এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে বহন করা যায় এমন ফোনকে বলে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন আবিষ্কারের আগে দূরবর্তী কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে টেলিফোন নামক যন্ত্র রাখতে হতো। এর সংক্ষিপ্ত নাম ফোন। বিভিন্ন বাড়ি বা অফিসে তারের মাধ্যমে ফোনগুলো যুক্ত থাকত। অন্যদিকে মোবাইল ফোন তারবিহীন প্রযুক্তি হওয়ায় এটি যেখানে খুশি সেখানে বহন করা যায়। মোবাইল ফোনকে কখনো সেলুলার ফোন, হ্যান্ড ফোন বা মুঠোফোন নামে অভিহিত করা হয়। মোবাইল ফোনে আজকাল কথা বলার পাশাপাশি আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির যাবতীয় সুবিধা ভোগ করা যায়। এই সুবিধা আছে যেসব মোবাইল ফোনে, সেগুলোকে বলে স্মার্ট-ফোন। এই স্মার্টফোনে কথা বলা যায়, খুদে বার্তা আদান-প্রদান করা যায়, ই-মেইল করা যায়, বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে পৃথিবীর যাবতীয় তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, গান শোনা যায়, নাটক দেখা যায়, রেডিয়ো শোনা যায়, টিভি দেখা যায়। অপরাধী শনাক্ত করার কাজেও আজকাল মোবাইল ফোন গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রথম চালু হয় ১৯৯৩ সালে। প্রায় ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দশ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

২. ক. ২০শে অক্টোবর, ২০২...

বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করলে কৃতার্থ হব।
বিনীত
ফাহিম
জয়পুর, ফরিদপুর।

জয়পুর বাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির প্রতি নজর দিন

ফরিদপুর জেলার জয়পুর বাজারের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আশেপাশের প্রায় দশ গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিন থেকে স্বাস্থ্যসেবা লাভ করে আসছে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এখানকার চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। বিল্ডিংগুলো পুরানো ও জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। নিয়মিত ঔষধ সরবরাহ নেই। আউটডোর, ইনডোর মিলিয়ে পাঁচ জন ডাক্তারের পদ শূন্য হয়ে আছে। সামান্য ঔষধপত্র যা আসে তারও ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার কেউ নেই। এভাবে সঠিক চিকিৎসার অভাবে রোগীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ছে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, কোনো রোগীর প্রতি সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসাটি প্রয়োগ না করার ফলে তার মৃত্যুও ঘটেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির দুরবস্থা থেকে উন্নতি না হলে গ্রামের মানুষের পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এ পরিস্থিতিতে এলাকার জনগণের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারা ফিরিয়ে আনতে এবং জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির মান উন্নত করে ও সংস্কার করে সেখানে উন্নত প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও ওষুধ সামগ্রীর সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন মহলে আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, এ ব্যাপারে যেন আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
ফাহিম
রেজাউর রহমান

২. খ. ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২...

বরাবর
বিক্রয় কর্মকর্তা
ঢাকা প্রকাশনী
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১০০০।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, পত্র পাওয়ার পর অবিলম্বে আপনাদের সদ্য প্রকাশিত নিম্নলিখিত বইগুলো অনুগ্রহ করে ভিপিপি যোগে পাঠিয়ে বাধিত করবেন। বইগুলো পৌঁছানো মাত্র আমি মূল্য পরিশোধপূর্বক ভিপিপি ছাড়িয়ে নেব ইনশাআল্লাহ।

আপনার বিশ্বস্ত
জনি
সিলেট।

বইয়ের তালিকা

১. পরীক্ষা প্রস্তুতি সিরিজ; নবম-দশম শ্রেণি; ঢাকা প্রকাশনী সম্পাদনা পর্ষদ; ১ সেট।
২. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনা সম্ভার; নবম-দশম শ্রেণি; এস.এম. মাহমুদুল হাসান; ২টি।

	ডাকটিকিট
প্রেরক জনি সিলেট।	প্রাপক বিক্রয় কর্মকর্তা ঢাকা প্রকাশনী ১৪, প্যারীদাস রোড, ঢাকা−১১০০।

৩. ক. লাইব্রেরির সঙ্গে নীরব মহাসাগরের তুলনা করা যায়। যুগ যুগ ধরে অগণিত জ্ঞানী-গুণী মানুষের চিন্তা-ভাবনা বইয়ের পাতায় স্থায়িত্ব লাভ করে। মানুষের অর্জিত জ্ঞান এই বইয়ের মাধ্যমে লাইব্রেরিতে সঞ্চিত হয়ে আছে।

৩. খ. পরিশ্রমের মাঝে যা পাওয়া যায় তার দাম যেমন অনেক, তার গৌরবও বেশি। যেকোনো উন্নতির মূলে রয়েছে শ্রমবৃদ্ধি, শ্রমসাধনা। আর যা করুণার দান, ভিক্ষার দান, তা গ্রহণ করায় রয়েছে লজ্জা। এর ভেতর কোনো গৌরব নেই।

৪. ক. এ পৃথিবীতে সুন্দর কর্মের জন্যই মানুষ মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে। অক্ষয় হয়ে থাকে তার মহৎ কর্মগুলো।

এ কথা চিরন্তন সত্য যে, মানুষ মরণশীল। তার দেহ একদিন মাটির সাথে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু এ নশ্বর পৃথিবীতে সে আপন কীর্তির মহিমায় অমরত্ব লাভ করতে পারে। মানুষ শুধু আহার-নিদ্রায়, ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। তার জন্মের মূলে নিশ্চয় স্রষ্টার একটা মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। নইলে মানুষকে বুদ্ধি না দিয়ে পশুর মতো করেই পৃথিবীতে পাঠানো হতো। মানুষের বুদ্ধিমত্তা আছে বলেই সে শুধু আত্মকল্যাণে জীবন কাটিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হতে পারে না, জনকল্যাণের মাঝে নিয়োজিত রেখেই সে তার মানুষ নামের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। ফলে এই জনকল্যাণের মাপকাঠি দিয়েই মানুষের জীবনের মূল্য পরিমাপ করা হয়ে থাকে। যে স্বার্থপর লোক শুধু নিজের সুখের জন্য কাজ করে এবং তার চারপাশের যেসব অসহায় নর নারী রয়েছে; তাদের দুঃখ মোচনের জন্য কোনো কিছুই করে না। মৃত্যুর সাথে সাথেই তার স্মৃতি চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যায়। তার জন্য কেউ শোক জ্ঞাপন করে না এবং তার কথা কেউ কোনো দিন মনে রাখে না। পক্ষান্তরে অন্যের জন্য যারা অকাতরে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, মৃত্যুর পরও তার কীর্তির কথা, তার মহত্ত্বের কথা কেউ ভোলে না। সে সকলের নিকট স্মরণীয়, বরণীয় হয়ে থাকে। মানুষ তার কর্মকে প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধা করে ।

মানুষ পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত বয়সকালের মধ্যে নয়; বরং তার সুকর্মের স্মৃতিতে যুগ যুগ বেঁচে থাকে।

৪. খ. ক্ষুধার্ত মানুষের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষুন্নিবৃত্তি। সব কিছুর মধ্যেই সে ক্ষুধা নিবৃত্তির কথা ভাবে। তখন কোনো কিছু সুন্দর কি অসুন্দর, তা তাকে ভাবায় না।

প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কতগুলো মৌলিক চাহিদা রয়েছে। খাদ্য হলো এর মধ্যে প্রধান মৌলিক চাহিদা। খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের শরীরে তৈরি হওয়া এই খাদ্যের চাহিদারই অপর নাম ক্ষুধা। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। মানুষ যে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, তার পেছনে এই ক্ষুন্নিবৃত্তিই মূল চালিকাশক্তি। ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ার পরেই মানুষ অন্যান্য মৌলিক চাহিদার কথা ভাবে। বাসস্থানের কথা ভাবে,

পোশাকের কথা ভাবে, স্বাস্থ্যের কথা ভাবে। সুন্দর-অসুন্দরের কথা ভাবে একেবারে শেষ পর্যায়ে। তাই ক্ষুধা যখন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সৌন্দর্যের মূল্য তার কাছে থাকে না। একজন সুখী মানুষের কাছে পৃথিবীকে সুন্দর মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে তা নাও হতে পারে। অতীতে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যেত। সামান্য দুটো রুটির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে সারাদিন পরিশ্রম করতে হতো। সেই দুর্ভিক্ষে একজন শ্রমজীবীর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ বড়োজোর একখানা ঝলসানো রুটির মতো মনে হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পৃথিবীর সৌন্দর্য কোনো তাৎপর্য বহন করে না। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তার সবচেয়ে আগে দরকার খাদ্য। গদ্যের কাঠিন্যটুকু সে ভালো উপলব্ধি করতে পারে; কাব্যের সুধা তার কাছে অর্থহীন।

৫. ক.

সড়কের বেহাল দশা : যাত্রীদের দুর্ভোগ

ফারদিন, চাটখিল (নোয়াখালী), ২২শে জুলাই ২০২...॥ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার জয়াগ বাজার থেকে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার হাসনাবাদ পর্যন্ত শহিদ মুক্তিযোদ্ধা একরামুল হক সড়কটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে সড়কটির কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। সড়কের এ বেহাল দশায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, বারো কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটির পুরোটাই বড়ো বড়ো গর্ত ও খানাখন্দে ভরা। জয়াগ বাজার থেকে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের নগরপাড়া সেতু পর্যন্ত দুই কিলোমিটার অংশে দুই পাশের মাটি সরে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে নোয়াখালীর চাটখিল ও সোনাইমুড়ি, কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম এবং চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার হাজার হাজার বাসিন্দা চলাচল করে। এছাড়া কমপক্ষে ত্রিশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পথে যাতায়াত করে থাকে। এলাকাবাসী জানান, সড়কটির তিন কিলোমিটার সোনাইমুড়ি এবং বাকি নয় কিলোমিটার চাটখিল উপজেলায় পড়েছে। বিগত ২০২... সালের বন্যায় সড়কটির সুরকির স্তর দেবে গিয়ে বালু বের হয়ে আসে এবং সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। এরপর প্রতি বর্ষায় বৃষ্টিপাতে পানি ও কাদায় সড়কটি একাকার হয়ে যায়, যা এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি পিকআপ ভ্যান ভাওরকোট গ্রামের কাছে রাস্তার গর্তে পড়ে যায়। এতে চালকসহ তিন জন যাত্রী আহত হন।

চাটখিল ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ মানুষ মনে করে, সড়কটি নিয়ে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। অথচ এর সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এটি মেরামতের জন্য স্থানীয় লোকজন সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনো প্রতিকার পায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৫. খ. ১৩ই মে, ২০২...

বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক সমকাল,
৩৮৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশের আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক সমকাল'-এ চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত থাকব।

বিনীত
স্বর্ণা
ফরিদপুর জিলা স্কুল, ফরিদপুর

ফরিদপুর জিলা স্কুলে নবীনবরণ অনুষ্ঠান

গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২... তারিখে ফরিদপুর জিলা স্কুলে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল আহাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীরা। তারপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ওই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সরোজ মোস্তফা। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়। বক্তব্য প্রদান করে বিজ্ঞান বিভাগের নবীন শিক্ষার্থী অপু ও মিতু, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত ও আবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী হাসান ও রফিক। এসময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শিক্ষকরা খুব মন দিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করার পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন। এরপর অতিথিরা স্মারক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। স্কুলের মাঠে নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরাতন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবাগত শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের একটি উষ্ণ ভাববিনিময় হয়। ভবিষ্যতে এই স্মৃতিগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : স্বর্ণা, মানবিক বিভাগ, দশম শ্রেণি
প্রতিবেদনের শিরোনাম : ফরিদপুর জিলা স্কুলে নবীনবরণ অনুষ্ঠান
প্রতিবেদনের ধরন : বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদন রচনার তারিখ ও সময় : ২৫শে জানুয়ারি, ২০২...; রাত ৯টা।

৬. ক. **ভূমিকা :** প্রকৃতির রূপ বড়োই বিচিত্র। প্রকৃতি মানুষের জন্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার এ প্রকৃতিই মানুষের জীবনে দুর্যোগ বয়ে আনে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, খরা, মহামারি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদ বিনষ্ট হয়। মানুষ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তবে আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। নানা কারণে বাংলাদেশে বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী : দুর্যোগ বলতে আমরা বুঝি, যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে বোঝায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক উপাদানের চরম অস্বাভাবিক অবস্থা, যাতে মানবসমাজ বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাই প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ বা অবস্থা। বাংলাদেশে হয় এমন প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

ঝড় : পৃথিবীর অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও তীব্র বাতাস ও বজ্র বিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টিপাত ঝড়ের সাধারণ চিত্র। এসময় সমুদ্র থাকে উত্তাল।

ঘূর্ণিঝড় : ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের তীব্রতা হয় অনেক বেশি। কখনো কখনো ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যায়। সমুদ্রে সৃষ্টি হয় জলোচ্ছ্বাসের। প্রতিবছরই এপ্রিল থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বরে বাংলাদেশে ছোটো বড়ো ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। প্রবল শক্তিসম্পন্ন এ ঝড়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালির উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমুদ্রতীরবর্তী দ্বীপসমূহ। ১৯৭০ সালে মেঘনা মোহনায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, গবাদিপশু ও ফসলেরও ক্ষতি হয় প্রচুর। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, প্রায় ছয় শত কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে শক্তিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। এর ফলে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশ্বের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টর্নেডো : বাংলাদেশে টর্নেডো আঘাত হানে সাধারণত এপ্রিল মাসে, যখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ থাকে। এটি স্বল্পকালীন দুর্যোগ, আঘাতও হানে স্বল্প এলাকা জুড়ে। কিন্তু যেখানে আঘাত হানে সেখানে মাত্র দশ-বিশ মিনিটের মধ্যেই ঐ এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

কালবৈশাখী ঝড় : কালবৈশাখী সাধারণত এপ্রিল-মে মৌসুমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এর গতিবেগ সাধারণত ৪০–৬০ কিলোমিটার হয়ে থাকে। ব্যাপ্তিকালও স্বল্প, কখনো কখনো এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। কালবৈশাখী সাধারণত আঘাত হানে শেষ বিকেলের দিকে। মাঝে মাঝে এ ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়।

বন্যা : বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয়। বন্যায় এদেশের এক বিস্তৃর্ণ ভূ-ভাগ প্লাবিত হয়। ঋতুগত কারণে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নদ-নদীর পানি বেড়ে যায় এবং নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও পাহাড়ি ঢল, জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের কারণে বাংলাদেশে বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় প্রাণহানি কম হলেও সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অনেক গবাদিপশু মারা যায়। বন্যাপরবর্তী সময়ে খাদ্যাভাব এবং নানারকম রোগব্যাধি দেখা দেয়। গৃহহীন হয়ে পড়ে অনেক লোক। বাংলাদেশে ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে সৃষ্ট বন্যায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে বন্যার পরপরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তাতে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। ২০১৮, ২০১৯ সালেও এদেশের কোথাও কোথাও ব্যাপক বন্যা হয়।

নদীভাঙন : বাংলাদেশে প্রতিবছর নদীভাঙনের ফলে বসতভিটা ও ফসলি জমি নদীর বুকে বিলীন হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক সহায় সম্বলহীন হয়ে গ্রাম থেকে শহরে আশ্রয় নেয়।

ভূমিধস : ভূমিধস পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি পাহাড়ি এলাকায় বর্ষা মৌসুমে মাঝে মাঝে পাহাড় ধসে পড়ে। পাহাড়ের কোলঘেঁষে গড়ে ওঠা অনেক ঘরবাড়ি চাপা পড়ে, ঘটে প্রাণহানি। নির্বিচারে ও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পাহাড় কাটার কারণেও ভূমিধস হয়। ভূমিধসের কারণে পাহাড়ি এলাকায় সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ভূমিকম্প : ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ ও মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও আসাম এলাকায় ১৮৯৭ সালে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় দেড় হাজার মানুষ মারা যায়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এ ধরনের ভূকম্প একই এলাকায় একশ থেকে একশ ত্রিশ বছর পর আবার আঘাত হানতে পারে। এছাড়া প্রতি বছর ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকায় এক বা একাধিক মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

আর্সেনিক দূষণ : ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলার অধিবাসীরা মারাত্মক আর্সেনিক দূষণের শিকার।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকার : প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবেই প্রাকৃতিক। এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে নিম্নোক্তভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায় :

১. এদেশের বন্যা সমস্যা মোকাবিলার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বনায়ন করা এবং নদীর পানি বহন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নদী খনন করা যেতে পারে।

২. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে লোকজনকে দ্রুত সরিয়ে নিতে হবে নিরাপদ স্থানে। প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

৩. ভূমিকম্প হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। ধ্বংসযজ্ঞ হলে দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষ অসহায়। তবু অদৃষ্টবাদী হয়ে বসে না থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা যেমন থাকা জরুরি তেমনি ব্যাপক জনসচেতনতারও প্রয়োজন।

৬. খ. **ভূমিকা :** অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং জনবল কাজে লাগিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উপার্জনের প্রত্যাশায় যখন কোনো কাজ করার পরিকল্পনা করে, তখন তাকে উদ্যোগ বলে। যারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের বলে উদ্যোক্তা। প্রতিটি পেশাকে কেন্দ্র করে উদ্যোক্তা হওয়া সম্ভব। একজন উদ্যোক্তা আত্মনির্ভরশীল হন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। কৃষিকে উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি বাংলাদেশে নতুন। বিপুল জনসংখ্যা, কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস, বেকারত্ব– এ সবকিছুর ভিতরে একদল তরুণ কৃষিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করছেন। শিক্ষিত তরুণদের কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পিত উদ্যোগ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা : কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তার মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন কৃষক তাঁর পণ্য বাজারে বিক্রির চেয়ে পরিবারের চাহিদা মেটানোকে বেশি গুরুত্ব দেন অথবা কিছুটা বিক্রির জন্য এবং কিছুটা পরিবারের চাহিদা মেটাতে ব্যয় করেন। অন্যদিকে, একজন কৃষি উদ্যোক্তার মূল লক্ষ বাজারজাতকরণ ও মুনাফা তৈরি। তাই একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে ব্যাবসায়িক মনোবৃত্তির হতে হয় এবং তার কাজে প্রচুর ঝুঁকি থাকে।

কৃষি উদ্যোগের ক্ষেত্রসমূহ : শস্য, প্রাণীসম্পদসহ কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়কে কৃষি উদ্যোগের আওতায় আনা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে অবশ্যই মূলধন, জমির পরিমাণ, মাটির গুণাগুণ, অবকাঠামো, বালাই ব্যবস্থাপনা, লোকবল, পরিবহণ ব্যবস্থা, বাজার ও চাহিদা উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। ধান, গম, ডাল, আখ, পাট, ঘাস, শাকসবজি, ফুল, ফল, মসলা, মধু, মাশরুম, রেশম, মাছ প্রভৃতির চাষ ও উৎপাদন; গরু–ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি প্রাণীসম্পদের লালন-পালন; গাছের চারা, জৈব সার, বায়োগ্যাস, দুধ ও দুধজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন ইত্যাদি কৃষি উদ্যোগের আওতাভুক্ত।

কৃষি উদ্যোক্তার করণীয় : একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে নিম্নোক্ত করণীয় সম্বন্ধে অবগত থাকা উচিত :

ক. উদ্যোক্তাকে প্রথমেই তার পণ্যের বাজার সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখতে হবে।

খ. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে অপচয় ও ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হয়। কারন, তাঁর এই উদ্ভাবনী বুদ্ধি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।

ঘ. কৃষিখাতে উদ্যোক্তাকে অনেক রকমের ঝুঁকি নিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে হবে এবং ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার সম্ভাব্য প্রস্তুতি রাখতে হবে।

ঙ. উদ্যোক্তা যে ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করবেন, সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্যের নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা জরুরি। উপযুক্ত খাবার, সার, কীটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ প্রযুক্তি সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। সম্প্রতি স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ব্যবহার উদ্যোক্তাদের সাফল্যে ভূমিকা রাখছে।

চ. একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কয়েকজন উদ্যোক্তা একসঙ্গে কাজ করতে পারেন। এতো বড়ো ধরনের কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় এবং ঝুঁকি হ্রাস পায়। তবে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে অংশীদার নির্বাচন করা উচিত।

ছ. পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, শ্রমিক ও পণ্য পরিবহণ, বাজার পরিস্থিতি ও প্রতিযোগীদের কথা চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি উদ্যোগ : কৃষির উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন :

ক. সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো কৃষির ধরন অনুযায়ী স্বল্প সুদে বিভিন্ন অঙ্কের ঋণ প্রদান করছে।

খ. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্যসম্পদ অধিদপ্তর উদ্যোক্তাদের যে-কোনো প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

গ. বছরব্যাপী চাষ করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে 'ডিজিটাল শস্য ক্যালেন্ডার' ও 'বালাইনাশক নির্দেশিকা' দেওয়া আছে, যা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল ফলাতে সাহায্য করে। ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে কৃষি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে জানাতে 'কৃষি প্রযুক্তি ভান্ডার' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষিদ্রব্যাদির বাজারদর, কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রেরণ করে।

উপসংহার : একজন কৃষি উদ্যোক্তা সফল হলে একদিকে যেমন দারিদ্র্য দূরীভূত হয়, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পায়। তবে কৃষি উদ্যোক্তাকে অবশ্যই সততার সঙ্গে কাজ করা উচিত। কারণ তাঁর পণ্য চূড়ান্ত বিচারে খাবারের চাহিদা মেটাবে।

৬. গ. **ভূমিকা :** বাংলার মুসলিম নারী জাগরণ ও নারীমুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও মুক্তমনা প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী ছিলেন। মুসলিম নারীশিক্ষার অন্ধকার যুগে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মহল্লায় মহল্লায় ছাত্রী সংগ্রহ করে নারীশিক্ষা বিস্তারে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি শুধু সমাজসেবিকাই নন, বাংলা গদ্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পীও বটে। সমাজের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য অসাধারণ পান্ডিত্যপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী গদ্য রচনাও তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি ছিল।

জন্ম ও বংশপরিচয় : ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে বিখ্যাত মুসলিম পরিবারে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দীন মুহম্মদ আবু আলী সাবের। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। এ পরিবারে পর্দাপ্রথা এত কঠোর ছিল যে, মহিলারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও চাকরানি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সামনে যেতে পারতেন না।

শিক্ষাজীবন : রোকেয়ার সময় মুসলমানগণ অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অশিক্ষার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। ইংরেজি শিক্ষার নামে তারা শিউরে উঠত, নারী শিক্ষাকে তারা মহাপাপ মনে করতো। এরূপ এক তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে বেগম রোকেয়ার জন্ম। রোকেয়ার পিতাও সমাজের কুসংস্কার হতে মুক্ত ছিলেন না। এ কারণেই রোকেয়াকে কুরআন শরিফ ছাড়া আর কিছুই পড়তে দেওয়া হয়নি। বেগম রোকেয়ার জ্ঞানপিপাসা ছিল অসীম। রোকেয়ার বড়ো ভাই আবুল আসাদ ইব্রাহীম সাবের তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। গভীর রাতে বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে বালিকা রোকেয়া মোমবাতির আলোতে বড়ো ভাইয়ের কাছে ইংরেজি ও বাংলা পড়তেন। শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যেও এভাবে দিনের পর দিন তাঁর শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। তাঁর বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ দেখে ভাইও তাঁকে যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদান করতে লাগলেন। আর এ সময়েই বেগম রোকেয়ার মনে মুসলিম নারী সমাজের দুর্গতি কীভাবে দূর করা যায় সেই ভাবনা জন্ম নেয় এবং এক্ষেত্রে তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেন সহযোগিতা করেন।

বৈবাহিক জীবন : বিহারের ভাগলপুরে রোকেয়ার বিবাহ হয়। তাঁর স্বামী ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। তাঁর সাহায্যে বেগম রোকেয়ার শিক্ষার ক্রমোন্নতি হয়। নিজে শিক্ষালাভ করেই বেগম রোকেয়া থামলেন না, তিনি বাংলার মুসলিম নারীদের দুর্দশাও লক্ষ করলেন। বুঝলেন, শিক্ষার বিস্তার না হলে তাদের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি নারীশিক্ষার প্রসারে নিয়োজিত হলেন।

কর্মজীবন : নিয়তির কী পরিহাস, বিয়ের নয় বছর পর ১৯১১ সালে রোকেয়াকে নিঃসন্তান অবস্থায় রেখে স্বামী সাখাওয়াত হোসেন পরলোকগমন করেন। সংসারের বাঁধন হতে মুক্ত হয়ে বেগম রোকেয়া নারী জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মনস্থ করেন। সে অনুযায়ী রোকেয়া শ্বশুরালয় ভাগলপুরে একটি স্কুল খুলে শিক্ষাদান করার চিন্তা করেন। কিন্তু স্কুল খোলায় নানারকম সমস্যা দেখা দেওয়ায় তিনি ভাগলপুর ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে স্বামীর প্রদত্ত শেষ সম্বল দশ হাজার টাকা দিয়ে তিনি ১৯১১ সালে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে স্কুল স্থাপিত হলো। রোকেয়া নিজেই স্কুলের ছাত্রীদের পড়াতে লাগলেন। কিন্তু অনেক বাধা বিপত্তি তাঁকে মোকাবিলা করতে হলো। বাড়িঘর, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে, শত বিদ্রূপ-অপমান সয়ে তিনি স্কুলের জন্য সংগ্রাম করে চললেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে তাঁর সাধনা সফল হলো। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল একটি প্রথম শ্রেণির ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হলো। এছাড়াও রোকেয়া সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কলকাতায় ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমান খাওয়াতীনে ইসলাম মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন।

সাহিত্যিক রোকেয়া : কর্মী রোকেয়া যত বড়ো, সাহিত্যিক রোকেয়া আরও বড়ো ও খ্যাতিমান। রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল তাঁর কর্মশক্তির অপূর্ব নিদর্শন। স্কুলের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন। তিনি 'মতিচূর', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী' প্রভৃতি বই রচনা করেন। তাছাড়া তিনি 'সুলতানার স্বপ্ন' (Sultana's Dream) নামক একখানা ইংরেজি বইও রচনা করেন। তাঁর রচিত বইগুলো বাংলার মুসলিম নারী জাগরণে এক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে পরিগণিত। তিনিই বাংলাদেশের মুসলিম নারী আন্দোলনের জন্মদাত্রী ও পথিকৃৎ।

উপসংহার : ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর এই মহীয়সী রমণী পরলোকগমন করেন। বেগম রোকেয়া নারী-মুক্তির দূত হয়ে এসেছিলেন। মুসলিম নারী সমাজের দুর্গতির কথা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাই বাংলার নর-নারী শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করে। কারণ রোকেয়ার কীর্তি অমর– তাঁর স্মৃতি অক্ষয়।

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. শব্দের শেষে ই-কার ও উ-কার থাকলে কোন বিভক্তি হয়?
ক –কে খ –এর
গ –তে ঘ –র

২. প্রযোজক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?
ক ইস খ উক
গ এন ঘ আই

৩. গঠনগত দিক দিয়ে বাক্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

৪. যৌগিক বাক্যের উদাহরণ কোনটি?
ক পরিশ্রমীরা জীবনে সফল হয়।
খ দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য।
গ বিপদ ও দুঃখ একসঙ্গে আসে।
ঘ যদি নিয়মিত সাঁতার কাটো, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

৫. রাজীব বাংলা ব্যাকরণে ভালো।– বাক্যে 'ব্যাকরণে' কোন কারক?
ক অধিকরণ খ অপাদান গ করণ ঘ কর্ম

৬. ভাববাচ্যের বাক্য কোনটি?
ক আমার যাওয়া হলো না।
খ চিঠিটা পড়া হয়েছে।
গ শরতে শিউলি ফোটে।
ঘ পুলিশ কর্তৃক ডাকাত ধৃত হয়েছে।

৭. বক্তার কথা উপস্থাপনের ধরনকে কী বলে?
ক বাচ্য খ নির্দেশক গ উক্তি ঘ অনুকার

৮. 'অনু' শব্দের অর্থ কোনটি?
ক পশ্চাৎ খ ক্ষুদ্রতম অংশ গ ভিতর ঘ একক

৯. রাত শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক তিমির খ শর্বরী
গ ক্ষণপ্রভা ঘ লোকান্তর

১০. 'ঠোঁট কাটা' বাগ্ধারাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক নির্লজ্জ খ বেহায়া
গ সংকীর্ণমনা ঘ অনমনীয়

১১. ভাব অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় কোনটি?
ক জমিদারি খ জ্যাঠামি
গ বাহাদুরি ঘ ডাক্তারি

১২. ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ কোনটি?
ক হাতঘড়ি খ গায়েপড়া
গ হাতেখড়ি ঘ কানাকানি

১৩. 'নিপাতনে সিদ্ধ' ব্যঞ্জনসন্ধি কোনটি?
ক একাদশ খ গবাক্ষ গ কুলটা ঘ গবাদি

১৪. 'ফারসি' শব্দের উদাহরণ কোনটি?
ক কার্তুজ খ তারিখ
গ বালতি ঘ দারোগা

১৫. নাম-বিশেষ্যের মধ্যে 'সৃষ্টিনাম' কোনটি?
ক বাংলাদেশ খ সজল গ রমজান ঘ সঞ্চিতা

১৬. শব্দদ্বিত্ব কয় ধরনের?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

১৭. বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ কোনটি?
ক জিভ খ তালু
গ মূর্ধা ঘ ওষ্ঠ

১৮. মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?
ক পাঁচ খ সাত গ দশ ঘ এগারো

১৯. 'সাধারণ' শব্দের উচ্চারণ কোনটি?
ক সাধারোন্ খ শাধারোণ্
গ শাধারন্ ঘ শাধারোন্

২০. 'অপসংস্কৃতি' সাধিত শব্দের 'অপ' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহার করা হয়?
ক বাজে খ অভাব
গ বিকৃত ঘ মন্দ

২১. অর্ধস্বরধ্বনির উদাহরণ কোনটি?
ক ঐ খ ঔ
গ আ ঘ ই

২২. ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি কোনগুলো?
ক ধ, ভ খ খ, ছ
গ ট, ঠ ঘ ত, থ

২৩. 'ভূত' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক পেতনি খ ভীরু
গ ভবিষ্যৎ ঘ প্রেত

২৪. যে সর্বনাম নৈকট্য বা দূরত্ব নির্দেশ করে তাকে কোন সর্বনাম বলে?
ক নির্দেশক খ অনির্দিষ্ট
গ সাপেক্ষ ঘ পারস্পারিক

২৫. অবস্থাবাচক বিশেষণের উদাহরণ কোনটি?
ক চালাক খ ঠান্ডা গ চলন্ত ঘ পাথুরে

২৬. দ্বিকর্মক ক্রিয়া রয়েছে কোন বাক্যে?
ক সে ঘুমায়। খ রমিক বই পড়ছে।
গ ছেলেরা মাঠে খেলছে। ঘ শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।

২৭. আজ বাংলাদেশ বনাম ভারতের খেলা। বাক্যে 'বনাম' কীসের উদাহরণ?
ক উপসর্গ খ অনুসর্গ গ যোজক ঘ প্রত্যয়

২৮. বিকল্প যোজক রয়েছে কোন বাক্যে?
ক যত পড়ছি, ততই নতুন করে জানছি।
খ তাকে আসতে বললাম, তবু এলো না।
গ রহিম ও করিম এই কাজটি করেছে।
ঘ চা না-হয় কফি খান।

২৯. সম্বোধন আবেগ রয়েছে কোন বাক্যে?
ক যাকগে, ওসব কথা থাক। খ আহ, কী চমৎকার দৃশ্য!
গ ওগো, তোরা জয়ধ্বনি করো। ঘ বেশ, তবে যাওয়াই যাক।

৩০. সামান্য অংশ বা অল্প পরিমাণ বোঝাতে কোন নির্দেশক বসে?
ক জন খ টুকু গ টা ঘ খানা

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

বিষয় কোড 1 0 2

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।
একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

(খ) জন্মদিনের সন্ধ্যা।

২। (ক) মনে করো, তোমার নাম জীত। তুমি রাজশাহীতে থাকো। তোমার জীবনের লক্ষ্য জানিয়ে মাতার কাছে একটি চিঠি লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি শিমুল। তুমি রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। বিদ্যালয়ে পাঠাগার স্থাপনের জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি দরখাস্ত লেখো।

৩। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

অথবা,

(খ) ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

৪। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

অভাব আছে বলিয়া জগৎ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। অভাব না থাকিলে জীব-সৃষ্টি বৃথা হইত। অভাব আছে বলিয়া অভাব-পূরণে এত উদ্যম, এত উদ্যোগ। সংসার অভাবক্ষেত্র বলিয়া কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলেই স্থানু-স্থবির হইত, মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনাময় হইত। মহাজ্ঞানীগণ অপরের অভাব দূর করিতে সর্বদা ব্যস্ত। জগতে অভাব আছে বলিয়াই মানুষ সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সেবা মানবজীবনের পরম ধর্ম। সুতরাং অভাব হইতেই সেবাধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। আর এ সেবাধর্মের দ্বারাই মানুষের মনুষ্যত্বসুলভ গুণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস–
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

৫। (ক) মনে করো, তোমার নাম পলাশ। তোমার বিদ্যালয়ের নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পর্কে 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একখানা প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি সোহান। 'প্রথম আলো' পত্রিকার প্রতিবেদক। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে একটি সংবাদ প্রতিবেদন লেখো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) বাংলাদেশের উৎসব

(খ) মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার

(গ) কৃষিকাজে বিজ্ঞান।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	গ	২	ঘ	৩	খ	৪	গ	৫	ক	৬	ক	৭	গ	৮	ক	৯	খ	১০	খ	১১	গ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	ঘ
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	গ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	খ

রচনামূলক

১. ক. একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। অমর একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর এ স্বীকৃতির মাধ্যমে বাঙালি এখন বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ঐতিহাসিক দিন এটি। দিবসটির রয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ক্ষমতালিপ্সু পাকিস্তান সরকারের হীন মানসিকতার প্রকাশ ঘটে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ "Urdu and urdu will be the only state language of Pakistan." ঘোষণা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার ছাত্রসমাজ তীব্র প্রতিবাদ করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানে আত্মপ্রত্যয়ী ছাত্রসমাজ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশের উদ্দেশে যাত্রা করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে সরকারের নির্দেশে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না-জানা অনেকে শহিদ হন। অবশেষে ছাত্রজনতার আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর প্যারিস বৈঠকে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক শাখা ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা' দিবসরূপে ঘোষণা করে। শহিদদের আত্মত্যাগের স্মৃতিকে স্মরণ করে ইউনেস্কোর এই ঘোষণা বাঙালির আরেক বিজয়। ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে প্রথম 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়। আর এভাবে আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব আসনে প্রতিষ্ঠিত।

১. খ. প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রিয় তার জন্মদিন। এই দিনের সন্ধ্যায় তার প্রিয়জনেরা যদি আয়োজন করে জন্মদিনের অনুষ্ঠান, তাহলে এর চেয়ে আনন্দের আর কী থাকে! জন্মদিনের সন্ধ্যায় আমন্ত্রিতরা যখন একে একে হাজির হয়, শুভেচ্ছা জানায়, স্মারক হিসেবে কিছু না কিছু উপহার হাতে তুলে দেয়, তখন তা মনকে খুশিতে ভরিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে কেক কাটা হয়। জন্মদিনের গান আর করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ঘর। সকলের চোখেমুখে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেক কাটার পরে থাকে নৈশভোজ। নৈশভোজে থাকে ভালো ভালো খাবারের ব্যবস্থা। সবার জন্মদিনের সন্ধ্যা যে এমন আনন্দের সঙ্গে কাটে, তা নয়। যাদের প্রিয়জনেরা সচ্ছল নয়, তাদের জন্মদিনের সন্ধ্যা হয়তো কোনো রকম আয়োজন ছাড়াই শেষ হয়। তবে আয়োজন হোক বা না হোক, জন্মদিনের সন্ধ্যা মানে জীবন থেকে একটা বছর হারিয়ে যাওয়া আর নতুন একটা বছরের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

২. ক.

১৫ই এপ্রিল, ২০২...
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

শ্রদ্ধেয় মা,

আমার সালাম নিবেন। আশা করি খুব ভালো আছেন। গতকালই আপনার চিঠি পেলাম। চিঠিতে আপনি আমার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আসলে প্রত্যেকেরই জীবনের লক্ষ্য স্থির করা উচিত। লক্ষ্য না থাকলে জীবনে উন্নতি করা যায় না।

আমার খুব ইচ্ছা আমি একজন ভালো ডাক্তার হবো। এজন্য আমি বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়ছি। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, আমার এসএসসি পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমি A^+ পাব। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর আমি ভালো একটা কলেজে ভর্তি হতে চাই। আর ডাক্তার হতে হলে আমাকে বিজ্ঞান বিভাগ ঠিক রাখতেই হবে। উচ্চ মাধ্যমিকেও ভালো ফলাফল করতে হবে। এজন্য জোরালো প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছি। কারণ ভবিষ্যতে ভালো ডাক্তার হওয়াই আমার স্বপ্ন। আমি দেখেছি, চিকিৎসার অভাবে আমাদের দেশে কত দরিদ্র মানুষ কষ্ট পায়, অকালে প্রাণ হারায় কত মানুষ। আমার ইচ্ছা, ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে আমি দেশের বিশেষত আমার গ্রামের হতদরিদ্র মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করব। চিকিৎসাসেবাকে আমি মহৎ মানবিক সেবা বলে মনে করি। আমি এ সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে চাই।

পরিশেষে এ মহৎ পেশার মাধ্যমে আমি যেন জনগণের সেবা করতে পারি, প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি একজন চিকিৎসক হিসেবে, এই দোয়াই আপনার কাছে প্রত্যাশা করি। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

ইতি
আপনার স্নেহের
জীত

[বি. দ্র. : পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

২. খ. ৫ই জুন, ২০২...

বরাবর

প্রধান শিক্ষক

রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর।

বিষয় : পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আমাদের বিদ্যালয়ে কোনো পাঠাগার নেই। ফলে জ্ঞানার্জন তথা শিল্পসাহিত্যে সময় ব্যয় করার মতো কোনো মাধ্যম নেই। এজন্য আমাদের সহপাঠীরা নানা রকম আড্ডাবাজিতে সময় নষ্ট করে। এতে কেউ কেউ বিপথগামীও হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই বিদ্যালয়ে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইতঃপূর্বে এ ব্যাপারে কয়েকবার আবেদন নিবেদন করেও কোনোপ্রকার সাড়া পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, মহোদয়ের কাছে বিনীত অনুরোধ যে, অত্র প্রতিষ্ঠানে একটি পাঠাগার স্থাপন করে বাধিত করবেন।

নিবেদক

শিক্ষার্থীদের পক্ষে

শিমুল

৩. ক. দুর্জন মানে দুষ্ট প্রকৃতির লোক। এ ধরনের মানুষ যত বিদ্বানই হোক না কেন তার সাহচর্যে একটি পবিত্র চরিত্র সহজেই কলুষিত হয়। তাই বিদ্বান দুর্জনের সাহচর্য ত্যাগ করা উচিত।

বিদ্যাশিক্ষা মানবজীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়। বিদ্বান মানুষ তাই সকলের দ্বারা সম্মানিত, সকলের নিকট পূজনীয়। বলা হয়ে থাকে, বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। জ্ঞানীর নিদ্রা মূর্খের ইবাদতের চেয়েও মূল্যবান। কথাটি হাদিসেই এসেছে। তাই জ্ঞানী বা বিদ্বান মানুষের মূল্য সম্পর্কে সংশয় থাকার কোনো অবকাশই নেই। বস্তুত বিদ্বান মানুষ আলোকিত, আলোকপ্রাপ্ত। পতঙ্গ যেমন আলোর কাছে ভিড় করে তেমনি সমাজের মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ। তাদের সঙ্গ ও সাহচর্য সবাইকে পরিতৃপ্ত করে। ধর্মীয় উপদেশ এবং জ্ঞানীদের নীতিকথায় সকলকে বিদ্বানের সান্নিধ্য লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তবে জ্ঞানী মানুষ পেলেই তার কাছে সভক্তিতে ছুটে যেতে হবে এমন নয়। বিদ্বান ব্যক্তি যদি সচ্চরিত্র ও সুন্দর মানবীয় গুণের অধিকারী না হয় তাহলে সে মূর্খের চেয়েও বিপজ্জনক। কারণ মূর্খ মানুষকে কেউ অনুসরণ বা অনুকরণ করে না। তাদের কথাও কেউ মানতে চায় না। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তির কথা মানুষ অন্ধের মতো অনুসরণ করে, তার জীবনাচরণকে অন্যরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই বিদ্বান ব্যক্তি যদি দুর্জন বা অসৎ হয় তাহলে তার দ্বারা সাধারণ মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটার আশঙ্কা খুব বেশি। তাই বিদ্বান ব্যক্তি চরিত্রবান কিনা, তা না দেখে তার প্রতি ঝুঁকে পড়া উচিত হবে না। বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যদি মানবজীবনে গড়ে না ওঠে তাহলে সে বিদ্যার কোনো মূল্য নেই। এ ধরনের মানুষ জ্ঞানপাপী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। আর জ্ঞানপাপীকে এড়িয়ে চলাতেই সকলের মঙ্গল।

দুর্জন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও সে সদা পরিত্যাজ্য। তার সাহচর্যে এলে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। তাই তার সাহচর্য ত্যাগ করা উচিত।

৩. খ. ক্ষুধার্ত মানুষের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষুন্নিবৃত্তি। সব কিছুর মধ্যেই সে ক্ষুধা নিবৃত্তির কথা ভাবে। তখন কোনো কিছু সুন্দর কি অসুন্দর, তা তাকে ভাবায় না।

প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কতগুলো মৌলিক চাহিদা রয়েছে। খাদ্য হলো এর মধ্যে প্রধান মৌলিক চাহিদা। খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের শরীরে তৈরি হওয়া এই খাদ্যের চাহিদারই অপর নাম ক্ষুধা। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। মানুষ যে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, তার পেছনে এই ক্ষুন্নিবৃত্তিই মূল চালিকাশক্তি। ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ার পরেই মানুষ অন্যান্য মৌলিক চাহিদার কথা ভাবে। বাসস্থানের কথা ভাবে, পোশাকের কথা ভাবে, স্বাস্থ্যের কথা ভাবে। সুন্দর-অসুন্দরের কথা ভাবে একেবারে শেষ পর্যায়ে। তাই ক্ষুধা যখন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সৌন্দর্যের মূল্য তার কাছে থাকে না। একজন সুখী মানুষের কাছে পৃথিবীকে সুন্দর মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে তা নাও হতে পারে। অতীতে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যেত। সামান্য দুটো রুটির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে সারাদিন পরিশ্রম করতে হতো। সেই দুর্ভিক্ষে একজন শ্রমজীবীর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ বড়োজোর একখানা ঝলসানো রুটির মতো মনে হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পৃথিবীর সৌন্দর্য কোনো তাৎপর্য বহন করে না। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তার সবচেয়ে আগে দরকার খাদ্য। গদ্যের কাঠিন্যটুকু সে ভালো উপলব্ধি করতে পারে; কাব্যের সুধা তার কাছে অর্থহীন।

৪. ক. জীবনে অসম্পূর্ণতা আছে বলেই মানুষ পূর্ণতার খোঁজ করে। অভাব দূর করার জন্যই সে কর্মপ্রচেষ্টায় রত থাকে। আবার কিছু মানুষ অন্যের অভাব পূরণের মধ্য দিয়ে মহান হয়ে ওঠে।

৪. খ. পরিশ্রমের মাঝে যা পাওয়া যায় তার দাম যেমন অনেক, তার গৌরবও বেশি। যেকোনো উন্নতির মূলে রয়েছে শ্রমবৃদ্ধি, শ্রমসাধনা। আর যা করুণার দান, ভিক্ষার দান, তা গ্রহণ করায় রয়েছে লজ্জা। এর ভেতর কোনো গৌরব নেই।

৫. ক. ১৩ই মে, ২০২...
বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক সমকাল,
৩৮৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশের আবেদন।
জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক সমকাল'-এ চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত থাকব।
বিনীত
পলাশ
ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২... তারিখে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল আহাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীরা। তারপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ওই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সরোজ মোস্তফা। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়। বক্তব্য প্রদান করে বিজ্ঞান বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থী অপু ও মিতু, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত ও আবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবীন শিক্ষার্থী হাসান ও রফিক। এসময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেকে তাদের দীর্ঘদিনের ছাত্রজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে চোখ অশ্রুসজল করে ফেলে। অনেকে আবার স্কুলজীবনের মজার স্মৃতিগুলো সবার সামনে তুলে ধরে। শিক্ষকরা খুব মন দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের নির্ভীকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন। এরপর অতিথিরা স্মারক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। স্কুলের মাঠে নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।
এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবাগত শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের একটি উষ্ণ ভাববিনিময় হয়। ভবিষ্যতে এই স্মৃতিগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : পলাশ, মানবিক বিভাগ, দশম শ্রেণি
প্রতিবেদনের শিরোনাম : ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা
প্রতিবেদনের ধরন : বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদন রচনার তারিখ ও সময় : ২৫শে জানুয়ারি, ২০২...; রাত ৯টা।

৫. খ.

শেরপুরে বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

সোহান, শেরপুর প্রতিবেদক, ১৪ই জুলাই, ২০২... : ১০ই জুন থেকে শেরপুরের ফুটবল মাঠে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় ৬৫টি স্টল মেলায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এ মেলা। মেলায় ছিল মানুষের উপচে-পড়া ভিড়। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণিসহ সব বয়স এবং সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। মেলায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিক্রি হয়।
মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন বিকালবেলা আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্দীপনামূলক ও গণসংগীতের ব্যবস্থাও ছিল মেলায়। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক জনাব আলি ইদ্রীস সুজন। আলোচনায় অংশ নেন শেরপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. ইফতেখারুল আমীন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জামিল হোসেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার মামুন সরোয়ার। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুর জেলাপ্রশাসক ইয়াসিন মোল্লা।
বক্তাগণ বলেন যে, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু রয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ৩০ শতাংশ বনভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে সে মোতাবেক অগ্রসর হতে হবে। বক্তাগণ প্রত্যেককে অন্তত তিনটি করে চারাগাছ লাগানোর জন্য আহ্বান জানান। তাহলে আমাদের দেশে অতিরিক্ত প্রায় ৬০ কোটি গাছ লাগানো সম্ভব হবে; যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। মেলায় সমাপনী দিনে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে সবুজায়ন নার্সারি।

৬. ক. **ভূমিকা :** গ্রামবাংলার উৎসব মানুষের প্রাণের স্পন্দন। বহুকাল আগে থেকেই আমাদের সমাজে নানা উপলক্ষ্যে উৎসব পালিত হয়ে আসছে। উৎসব আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যম। বাঙালির জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবের প্রভাব অনস্বীকার্য। এটি মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে। মানসিক বিকাশে ও আনন্দদানে সামাজিক উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির চেতনায় মিশে আছে।

উৎসব : সহজ কথায় 'উৎসব' কথাটির অর্থ হলো আনন্দ বা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। এটি হলো মানুষের আনন্দ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। মূলত উৎসব বলতে এমন অনুষ্ঠানকে বোঝায়, যা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

উৎসবের ধরন : উৎসবকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন– ব্যক্তিগত উৎসব, পারিবারিক উৎসব, সামাজিক উৎসব, ধর্মীয় উৎসব, রাজনৈতিক উৎসব, সাংস্কৃতিক উৎসব, জাতীয় উৎসব, স্মরণোৎসব প্রভৃতি। বিভিন্ন দিবস বা উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষ এসব উৎসব পালন করে থাকে।

সামাজিক উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক উৎসব হলো পহেলা বৈশাখ। এরূপ সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের ধারক। ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক উৎসবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেয়। বাংলা বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শেণির মানুষ উৎসবে মেতে ওঠে। পহেলা বৈশাখের সাথে মেলার সম্পর্ক সুনিবিড়। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলায় আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প প্রদর্শনী, নাচ, গান, লাঠি খেলা, পুতুলনাচ, সার্কাস প্রভৃতি দর্শকদের আনন্দ দেয়। পহেলা বৈশাখকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা বর্ণাঢ্য বৈশাখী মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। পহেলা বৈশাখের সাথে আরও দুটি অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত। একটি হলো পুণ্যাহ এবং আরেকটি হলো হালখাতা। পুণ্যাহ প্রাচীন জমিদারদের খাজনা আদায়ের অনুষ্ঠান। তাই জমিদারি প্রথা না থাকায় এখন এ অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর হালখাতা অনুষ্ঠান এখনো প্রচলিত আছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। পহেলা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা পুরাতন বছরের হিসেবের খাতা বাদ দিয়ে নতুন বছরের হিসেবের খাতা খোলে। দোকানপাট রঙিন কাগজ দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর করে সাজানো হয়। আর ক্রেতাদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় ও বকেয়া টাকা তোলা হয় এ দিনে। এছাড়াও ইংরেজি মাসের প্রথম দিন ইংরেজি নববর্ষ পালন করা হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। নবান্ন উৎসব, বসন্তবরণ উৎসব, বর্ষবরণ উৎসব, উপজাতিদের বৈসাবিসহ বিভিন্ন উৎসব আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ। বিয়ে একটি প্রাচীন সামাজিক প্রথা। বিয়েকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এছাড়া পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলের সম্মিলনে একটি প্রাণময় উৎসব হলো বিয়ের অনুষ্ঠান, যা অন্যতম একটি সামাজিক উৎসব।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উৎসব : মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু বিষয় বা ঘটনা নিয়েও বিভিন্ন উৎসব পালন করার রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। আবার পারিবারিক বিভিন্ন উৎসব; যেমন– বিবাহ, সুন্নতে খাতনা, সন্তানের অন্নপ্রাশন, হিন্দুদের শ্রাদ্ধ, নবান্ন প্রভৃতি উৎসব পারিবারিক পরিবেশে অত্যন্ত জৌলুস করে পালন করা হয়। অনেক পরিবারে অনেকে জাঁকজমকপূর্ণভাবে জন্মদিন পালন করে থাকে। আবার পরিবারের কারও বিয়ে উপলক্ষ্যে সেই বাড়ি বা এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবার নিজস্ব বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। এদেশের প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলমান। মুসলমানদের প্রধান দুটি উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর মুসলমানরা ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করে। আর ঈদুল আজহায় পশু কোরবানি করা হয়। এছাড়াও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা মহররম, হিজরি নববর্ষ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি (স), শবে বরাত, শবে কদর প্রভৃতি উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। এছাড়াও রয়েছে দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, চৈত্রসংক্রান্তি, হোলি প্রভৃতি উৎসব। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে হিন্দুদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে চলে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব বৌদ্ধ পূর্ণিমা। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো উৎসব যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন বা বড়োদিন। এছাড়া ইস্টার সানডেতেও খ্রিষ্টানরা উৎসব পালন করে থাকে।

সাংস্কৃতিক উৎসব : বাঙালির রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে যে সংস্কৃতির চর্চা করে তা বোঝা যায় বাংলাদেশের পালিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব দেখে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বইমেলা, বিজ্ঞান মেলা, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব। এছাড়া আলোচনা সভা, জ্ঞানচর্চামূলক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতিও সংস্কৃতিকে দৃঢ় করে। সংস্কৃতিমনা লোকেরা এসব উৎসব থেকে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করে। তাছাড়া জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, এশীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, লালন উৎসব, পিঠা উৎসব, ঘুড়ি উৎসব প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করে। সাংস্কৃতিক এসব উৎসব গ্রামবাংলার সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

জাতীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় উৎসব হলো **২৬শে** মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও **১৬ই** ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এ দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এদেশের মানুষ পালন করে। দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ এসব দিবস উদ্‌যাপনে অংশ নেয়। বাঙালি জাতির জীবনে এসব দিবস পরিণত হয়েছে জাতীয় উৎসবে। এসব উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, সেমিনার, মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মেলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন থাকে। **২১শে** ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। দিবসটি বাঙালি জাতির জন্য এক শোকবিধুর দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হয়। এ বইমেলা আমাদের জন্য একটি জাতীয় উৎসব। জাতীয় উৎসবগুলো সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।

উৎসবের অসাম্প্রদায়িক চেতনা : এদেশের সামাজিক উৎসব সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনার স্মারক। সুখী ও সমৃদ্ধ দেশগঠনের পূর্বশর্ত হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমাজ গঠন। আর এসব উৎসব মানুষকে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে বাস করে। ঈদ উৎসবে মুসলমানরা অন্য ধর্মের বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ জানায়। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি বড়ো বড়ো উৎসবে হিন্দুরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমন্ত্রণ জানায়। খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধরাও তাদের উৎসবে সবাইকে দাওয়াত করে। এভাবে প্রতিটি ধর্মের লোকেরা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আর ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গড়ে ওঠে ভ্রাতৃত্ববোধ।

উপসংহার : বাংলাদেশে বহু সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান হয়। যেকোনো উৎসবই আবহমান বাঙালি-সংস্কৃতি ধারণ করে। উৎসবের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তা। তাই জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. খ. **ভূমিকা :** মাদকাসক্তি আমাদের সমাজের ভয়াবহ একটি সমস্যা। কিছু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষ নিজেকে মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। একটি জাতির উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করে তরুণসমাজ। কিন্তু মাদক তরুণসমাজের সেই অদম্য কর্মপ্রেরণাকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে নিজেকে যেমন ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তেমনি দেশকেও মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাই এর প্রতিকার করা অত্যাবশ্যক।

মাদকের আবির্ভাব বা উৎস : নেশার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মদ, গাঁজা, আফিম, চরস বা তামাকের কথা বহু অগে থেকেই মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে মাদকের ব্যবহার শুরু হয়, যাকে ইংরেজিতে ড্রাগ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের ব্যথার উপশম হিসেবে ড্রাগের ব্যবহার হলেও পরে হতাশা কাটাতেও তারা ড্রাগ ব্যবহার করতো। এরপর থেকেই কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশে নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ড্রাগের ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীব্যাপী।

মাদকদ্রব্যের প্রকারভেদ : সমাজে নানা ধরনের মাদকদ্রব্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– হেরোইন, প্যাথেড্রিন, এলএসডি, মারিজুয়ানা, কোকেন, হাসিস প্রভৃতি আধুনিককালের মাদকদ্রব্য; তবে এর মধ্যে হেরোইন ও কোকেন বেশ দামি। আমাদের দেশের যুবসমাজ সচরাচর যে মাদকদ্রব্যগুলো ব্যবহার করে সেগুলো হলো– সিডাকসিন, ইনকটিন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, ডেক্সপোটেন, গাঁজা ইত্যাদি। তবে এ সবকিছুর ব্যবহারকে ছাড়িয়ে গেছে অত্যাধুনিক এক মাদক যার নাম ইয়াবা।

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার : দেশে মাদকের ব্যবহার বহু বিচিত্র। মানুষ নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ করতে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। মাদকের ব্যবহার করে সে কল্পনার জগতে বিচরণ করে। এক্ষেত্রে মাদক ব্যবহারকারীরা নানা ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে। যেমন– ধূমপান, ইনহেল বা শ্বাসের মাধ্যমে, জিহ্বার নিচে গ্রহণের মাধ্যমে, সরাসরি সেবনের মাধ্যমে, স্কিন পপিং ও মেইন লাইনিংয়ের মাধ্যমে। তবে যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন তাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো নেশায় উন্মত্ত হওয়া। প্রথমে কৌতূহলের বশে অনেকেই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে অভ্যস্ত হয়ে ভয়াবহ এক সর্বনাশের পথে এগিয়ে যায় তারা।

মাদকাসক্তির কারণ : এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ ব্যক্তিজীবনের হতাশা। মানুষ যখন জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়ে, তখন সে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয়। হতাশাগ্রস্ত সাধারণ তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের হারও অনেক বেশি। তাছাড়া অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হয়েও অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। যেসব পরিবারে পারিবারিক অশান্তি অনেক বেশি, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের জীবন বিশৃঙ্খল হতে থাকে। তারা এই বিশৃঙ্খলা থেকে ধীরে ধীরে মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরা প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় এ ধরনের অনেক ঘটনাই লক্ষ করি। বেশির ভাগ মাদকসেবী দেখা যায় যারা বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীর সংস্পর্শে মাদকে আসক্ত হয়, তবে পারিবারিক অশান্তিই মাদকাসক্তির বিশেষ কারণ হিসেবে দেখা যায়।

মাদক চোরাচালান : সাধারণত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদক চোরাচালান হয়। সীমান্তে স্থল বা জলপথে এবং আকাশপথে বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ মাদক চোরাচালান নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে যার পেছনে রয়েছে বিরাট এক সিন্ডিকেট। কিছুকাল আগেও মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের 'স্বর্গভূমি'। তবে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই নেটওয়ার্ক ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পরেই চোরাচালানকারীরা ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে গড়ে তোলে ড্রাগ পাচারের নতুন ভিত্তিভূমি, যার নাম 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'।

বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন : বাংলাদেশে মাদকের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা এই মাদক আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মায়ানমার থেকে অবাধে এদেশে প্রবেশ করছে ইয়াবা, যাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে বহু তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতি। দর্শনার 'কেরু এন্ড কোম্পানি' এদেশের একমাত্র লাইসেন্সধারী মদ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তার বাইরে বহু বিদেশি কোম্পানির মদ অবৈধভাবে অবাধে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গাঁজা ও আফিমের মতো মাদকদ্রব্যও অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতা : মাদকাসক্তিকে অপ্রতিরোধ্য রোগ এইডসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাদকাসক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ইয়াবা ও হেরোইনের মতো মাদকদ্রব্য মানুষের শরীরের সমস্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এর আসক্তিতে মানুষ এক অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে। নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ জীবনে ফিরে আসাও খুব সহজ হয় না। শরীরে মাদক গ্রহণ বন্ধ করা মাত্রই 'উইথড্রয়াল সিমটম' শুরু হয়। তখন মাদক না পেলে শুরু হয় টার্কি পিরিয়ড; হাত পা কাঁপতে থাকে; অসম্ভব শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তা হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে। তখন সুচিকিৎসা না পেলে খুব অল্প সময়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ : বিশ্বজুড়ে যে মাদকবিষ ছড়িয়ে পড়ছে তার থাবা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সমাজসেবীরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দেশে দেশে নানা সংস্থা ও সংগঠন মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। আমাদের দেশেও মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যম মাদকবিরোধী জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে :

১. মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভেষজ ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ,
২. সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নেশার হাতছানি থেকে তাদের দূরে রাখা,
৩. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মাদকাসক্তির মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা,
৪. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা,
৫. বেকার যুবকদের জন্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

উপসংহার : মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যায় তরুণরাই বেশি আসক্ত। একটি দেশের গতিশীলতাকে অব্যাহত রাখে তরুণসমাজ। তারাই যদি মাদকের কবলে পড়ে নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, তবে দেশের সার্বিক অগ্রগতি চরমভাবে বিনষ্ট হবে। তাই তরুণসমাজকে মাদক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এর কারবারিদের সর্বাগ্রে বয়কট করতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা বাংলাদেশ মাদকমুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হোক।

৬. গ. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রম পরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানবসভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।